মন্-আমি

—সুধীর চাকী—

IND-HOME LIBRARY

প্রকাশক—

ইন্দ-হোম্ লাইব্রেরী।

৪১/২এ বদ্রিদাস টেম্পল্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩৩৯

বাব্‌লু সিরিজ
(১)

বাব্‌লু আজ পৃথিবীতে নাই, কিন্তু তার শিশু মুখের সুন্দর স্মৃতি এখনো আছে—স্মৃতির সেই দুর্ব্বলতাই বাব্‌লু সিরিজের প্রাণ। আধুনিক গল্প ও উপন্যাস দিয়া এই সিরিজ সুধীবৃন্দের সেবার ভরসা রাখে।

বিনীত—
ইন্দ্‌-হোম্‌ লাইব্রেরী।

কে

উপহার

দাম পাঁচ সিকা

Printed By—
Suresh Chandra Datta
At the
NAVAYUVAK PRESS
3, COMMERCIAL BUILDINGS,
CALCUTTA.

স্বপ্নকে

এগারটি গল্প—

মন্-আমি

এক ঘণ্টা

হরিপদর ডায়েরী

ক্ষুধার্ত্ত টাকা

শক্তু-কলস

সদর-অন্দর

প্রেম ও গৃহ

জীবন না মৃত্যু না আরও কিছু

উল্টা-সিধা

এক বৃন্তের

অনামী

মন্‌-আমি

কলিকাতা।

নন্দন ভিলা।

অক্টোবর ১৯, ১৯৩৩।

মন্‌-আমি,

আজ তিন চারদিনের অবিশ্রান্ত টিম-টিমানি বৃষ্টিতে কল্‌কাতা সহরটা যেন একটা জন্তুর সামিল হয়ে উঠেচে। জীবন-শ্রীর ওপরে তার এই ভেজা গ্লানি যেন ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে উঠ্‌চে। রাত হয়েচে বেশ। রিক্সাওয়ালার ঠিমা-ঠিমা-ঠুন্‌-ঠুন্‌, মোটরের বিভ্রান্ত কাতর হর্ণ—সব ভেদ করে' যেন ঝরে' পড়চে হিম ধরিত্রীর নিঃশব্দ নিঃশ্বাস।

…………বালিশে মুখ গুঁজে আছি, চুপ করে'। কী দুরন্ত নিঃসঙ্গতা! দেখতে পাওনা? বোঝনা! আমায় আরো ব্যাকুল করো কেন? কেবল, চিঠি, চিঠি, চিঠি। আমার চেয়েও আমার চিঠি! ঈর্ষা হয় যে। কেন—আমার কাছ থেকে উদ্দীপনা আর

আমোদ পেয়ে হৃদয়কে তাজা রাখ্‌চ কি? কেমন করে' আমায় তুমি চাও? কি!

……বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে ছিলে একদিন মহাদেব বসুর দিকে—অনেকক্ষণ। ভোলনি নিশ্চয়ই। এইতো গেল মাঘোৎসবে! আজ সেই কথাই মনে উঠ্‌চে—বারবার। প্রশ্নো ক'রোনা—আমি ওর কথাই আজ বল্‌ব। শোনো। শোনো না।

ওর নাসা উন্নত অস্বীকার করিনা; কিন্তু নাসারন্ধ্রদুটো কেমন বেঁকে উঠে ওর ভেতরের কী এক বক্রগতি সূচিত করে যেন। চোখ ওর ভাসা-ভাসা হয়ে'ও যেন ক্ষুদ্র—বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার কি এক ধরণের সাদৃশ্য। ভীত ধূর্ত্ত, অথচ আত্মাভিমানহীন। দ্যাখো, ক্ষমা ক'রো মন্—এত আমার মহাদেবচরিত বর্ণনা নয়, এ সেই ঈর্ষা। হাজারো বার ক্লান্ত হয়ে' উঠেচ পুরুষের ভিড় ঠেলে পথ চল্‌তে, আমার ঈর্ষার ভয়ে। কিন্তু ঈর্ষারই তাড়নায় ঐখানে তোমায় পেতে আমার এ হিংস্র আনন্দ। তোমার পরিপূর্ণ পরিচয়ের জন্য আমার হারও আমি মাথা পেতে নেব—ঈর্ষাকেও দেব বলি—এ হিংস্রতার সেইটুকুই সত্য।

কিন্তু বর্ণনা হচ্চে, মহাদেব বসুর। ওর ললাট অপ্রশস্ত হলে'ও তার মধ্যে বেগ আর শক্তি-মত্তার আভাস আছে। হাসিটি ওর অপরূপ, আন্তরিকতা আর উদারতায় এক পশ্‌লা স্নিগ্ধ বর্ষণের মতো তা যেন হৃদয় ছুঁয়ে যায়। চিঠির সঙ্গে ফটো যাচ্ছে—দেখো। আর হাসি? দেখাব, যত শীগ্‌গীর পারি।

······তোমায় আকর্ষণ করেচে ভেবেই এত কথা লিখ্‌তে ব'সেচি এমন ভেবোনা যেন! একে করুণার যোগ্য মনে হচ্চে বলেই বোধ হয় এমন বিশদ করে' বল্‌তে পার'চি। সত্যি ঈর্ষা যাকে কর্‌ব তাকেও এম্‌নি করে' আঁক্‌তে পার্‌বতো!······

আবার সরে' গেছি।

······বাহিরের মনগুলোতে, বিশেষ, ষোলো-আঠারো-উনিশের মেয়েদের, জোয়ার বয়ে' আন্‌বার একটা অক্লান্ত জোর আছে এর। সেটা কিসের জানো?

মহাদেব ঠিক রমণীস্তাবক নয়; যদিচ এর চিঠিতে 'তুমি হরিণাক্ষী', 'তুমি দেবী', এই ধরণের স্তুতির টুকরো-টাক্‌রা লেখা ঢের দেখেচি। ঠিক দেহ-মাংসাত্তও নয়, যে এর লেলিহান বাসনা-রসনার সৌন্দর্য্যে ললনাপতঙ্গীর দল ঝাঁপিয়ে পড়ে' দ্রংষ্ট্রাগত হয়। রমণীভুক্‌ নয়, তা' বলিনা, অনেকেরই শারীরস্রোত মহাদেবস্রোতে লীন হয়ে' নীরবে গেছে মিলে। কোথায় মহাদেবের নীতিবোধের সীমা, তাও বুঝিনা। মিথ্যাচার এর সহজ আচারেরই মতো, কিন্তু বোকা স্বজনের কাছে এ মাত্রাতিরিক্ত অকপট। নিষ্ঠুরভাবে অপরের চোখে ধুলো দিয়ে শোষণের ভঙ্গী এর এত ঋজু আর ভূমিকাবিহীন যে তা দেখ্‌লে ব্যথা লাগ্‌বে তোমার। পয়লা নম্বরের বোহিমিয়ো হয়ে'ও বিনা দামে মহাদেব কিছু বিকোয় না— মূল্যতত্ত্বের জ্ঞান তার এম্‌নি টন্‌টনে।

এতক্ষণ পরে বলি, এর চরিত্রের বল নাই, আছে প্রবৃত্তির বেগ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার টানাটানিতে পড়ে' এ বেগ আবেগের ঘাড়

ভেঙে করে জয়, প্রবৃত্তির মুখে শিকার ওঠে শবদেহের মতো।
তোমার প্রশ্ন করা উচিত—কিসের এ বেগ? প্রবৃত্তি তো ক্ষুধা, তার স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে, বেগের উদ্ভব সেখানে হয় কি করে'? —এক প্রকারের আবিল ঔদাস্যে মহাদেব এখানে কাজ চালায়। সারা পৃথিবীই মহাদেবের কাছে লিলিপুশিও, একসঙ্গে এক চিঠির চারটে কাপি করে' চার জনের সঙ্গে চতুষ্পদী প্রেমাভিযানে তার এতটুকু অসুবিধে নাই। সে ঔদাস্যের ওপরে ভাসে সাত্ত্বিকতার আভা, তলে তার, অবহেলার কড়া রাজসিকতা—রমণীহৃদয় সে মুচড়ে ভাঙে। কতো দুর্ম্মূল্যই না জানি মহাদেব-বিজয়! ভেবে অগ্রসর হতে' না হতে' ব্যবহারের হাটে পণ্যের মত যায় এ রমণী ছড়িয়ে—মহাদেব তার ঔদাস্য নিয়ে আবার সওদায় বেরোয়।

…………ভাবচ, এত করে' কি বলতে চাই আমি মহাদেবের? বলতে চাই, এর গেল দু' বছরের ইতিহাস। জীবনের কোন্ দানবীয় ছন্দে মহাদেবের ভালোবাসা-বাসির এই ব্যাধবৃত্তি। কি ভালোবাসে মহাদেব? কেন? শিশু-জগতের শৈশবপনা নিয়ে 'আমি ভালোবাসি' আর 'আমি ভালোবাসি' বলে' কপোত-কপোতীর মত এ শতাব্দীর মানুষ ঝিমোবে এ আমি ভাবতে পারিনা। তাইতো গেল কদিন ক্রমাগতই ভাবছি ওর প্রেমাভিযান রোগের নিদান কি? তুচ্ছ রমণীয়তার লোভে ও-যে মাকড়সার মত আপনাকে আপনি বন্দী করলে, কেন? ব্যাখ্যা খুঁজছিলাম।

ফাঁকে আবার বলি, মহাদেবের শারীর-বিন্যাস সত্যিই অতুল-

নীয়। কোমর সরু, বুক চওড়া, সদর্প এবং শক্ত। বাহু দুখানি থস্‌-খসে বা থল্‌-থলে নয়, অথচ শৌর্য্যে-সৌরভে শ্রীমণ্ডিত। করস্পর্শ উষ্ণ, নমনীয়, আবেগে তরঙ্গায়িত।

…………শোনো, এবার আসল ঘটনাটা। মহাদেব আর ঋত্বিক (মনে পড়্‌চে সেই মুখচোরা—একেও তো দেখেচ, মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখ সদাই আনত) সুইচ্‌ টিপে ঘর অন্ধকার করে' এই কলকাতারই এক ত্রিতল কক্ষে বসে'। বছর দুই হ'ল দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা সাঙ্গ করেচে, কিন্তু মনের গরম কাটিয়ে রুটির বাজারে দাঁড়াতে পারেনি। ঠিক এই সময়ই তোমার সঙ্গে এদের পরিচয়, আদর করে' খাওয়ালে, মনে আছে?

ঋত্বিক আর একবার বিরক্তি প্রকাশ করে বল্‌লে, 'আঃ থামো না মহাদেব।' মহাদেব ওর হাতে হাতের চাপ দিয়ে বল্‌লে, 'চিনির এক্সপেরিমেণ্ট শেষ কর্‌লেই থামি। ভাবো ঋত্বিক দা, এক মণ চিনিকে চার সের জল খাওয়ান মানে চিনি রাজ্যের খোলনৈচে বদ্‌লানো কিনা! ভাবো ফরেণ কম্পিটিশ্যন মুখ থুব্‌ড়ে পড়্‌বে কিনা তাতে? ক'টা সুগ্যার ফ্যাক্টরি তাতে—এসো ওটা শেষ করি। তারপর ইউরোপ পালিয়ে তড়িতে এস্‌পেরেণ্টোয় গবেষণা শেষ করে' টেলিফোনের কলে কি যে অসম্ভব হবে আমিতো ভাবতে পারচি না।

…………নাঃ তোমার কি যে হ'ল ছাই? বিশ্ব ফেঁপেই ফেটে যাক্‌, আর সূর্য্যেরই হিমাঙ্গ হোক্‌ ভারী সাধ হয় যদি

বিশ্বের কাজে লাগতুম এতটুকু! জানো, সেদিন বস্‌ল্যবরেটরিতে ·········এমন সব····· ঋত্বিক আর একবার বল্‌লে,

'থামোনা মহাদেব·········'

মহাদেব আলো জ্বাল্‌লে। দেখলে ঋত্বিকের চোখে যেন কি এক আড়ষ্ট দেদীপ্যমানতা। কচি ঘাসের প্রথম রৌদ্রের ঘন সজীবতার সঙ্গে এসে মিশেচে যেন শেষ সূর্য্যের অস্তায়মান আবিল রক্তিমতা।

দুইবন্ধু পরস্পারের প্রেমে পরস্পরকে স্পর্শ কর্‌লে। মহাদেব বন্ধুর প্রতিভাদীপ্ত সাহস ও শক্তি ঋত্বিকের এই নধর-নীরব দুর্ব্বলতার পানে চেয়ে করুণায় নম্র হয়ে উঠ্‌ল।

'তোমার কি হয়েচে ঋত্বিকদা?'······উত্তরে তার একটু 'উঁ' এল মাত্র।············

মনোরাজ্যে মহাদেবের তখন উত্তাল উৎসাহ। প্রাণের ভাঙন ভেদ করে', তাই তার জীবনস্রোত ঠেলে উৎরে যাচ্চে যোদ্ধৃজনোচিত রক্তাঙ্কিত জয়োল্লাস।············

······কিন্তু কত করুণ এই পোড়া মানুষ, আর এই এদের বিকলাঙ্গ মন। সীমাবদ্ধ দারিদ্র্য আর রুগ্ন ভবিষ্যতের কৃপণ স্বপ্ন! কি কর্‌বে এ দুর্ভাগার দল? কি নিয়ে বাঁচ্‌বে এর যৌবন, যা নিয়ে মর্‌বে তার গৌরব যদি এর অন্তরে না পৌঁছয়! চেয়ে দেখ, ঐ অসহায় যুবক-যুবতীর ভিড়! স্বাধীনতা আন্দোলন এদের সহ্য হ'লনা—হয়, তাতে আসে মাটির গুণে, কীর্ত্তন আর ধুলট্, নয় আসে ডিস্‌পেপ্‌টিক্ রুগীর মৃত উদাসবাদ—জিনিষের কদর্য

ভুলে গিয়ে কাটতি লক্ষ্য করতেই এদের সময় কাটে। আধুনিক কৃষ্টির এরা না দেখ্লে মরিচীকা, না জানলে তার মরুদ্যান! অর্ব্বাচিন গোঁ ধরে' এরা বাহানা ধর্লে শুধু ইন্দ্রিয়ের ইনাম পাবার।

কে এদের অভয় দেবে? কে এদের সত্য-সন্ধানের বল দেবে! পেট পুরে এরা খায়না, ভাবে, প্রাক্তন। পৃথিবীর চলার পথের চাকার চিহ্ন এরা—হয় কেরাণী, নয় বাবু-ধোবিখানার অপদার্থ ম্যানেজাব! কোথায় যাবে এরা? এ ভাঙা দেশের ভাঙা হাটে খুব বীর যুবক তাই তার খুব বড় দুর্ব্বলতাকে চাখিয়া-টিপিয়া চলে, ঘোরে, টক্কর খায়, আর প্রেম করে।……

মহাদেব বসুর চিনির এক্স্পেরিমেন্ট তাই টাকা পর্য্যন্ত এগিয়ে, পিছিয়ে এলো; ইউরোপ যাবার সখ তাই তার ভারত মহাসাগরের বহু দূরেই ভরাডুবি হ'ল। অ্যানার্কিষ্ট হবে, কমিউনিজম্ ভাঁজবে—দুয়েকটা বেয়াড়া লাঠি আর গুলিতে তা উবে' গেল—টিকে থাক্ল সামন্তী যুগের রক্ত আর উদরের যৌথ সমস্যা। টাকা উপায় হয়না, বাপ-মা আর পরিবারে বাড়িতে আনন্দ নাই; মার্চ্চেন্ট আপিস থেকে কুমারটুলি—'কর্ম্মখালি' নাই কোথাও। অথচ জীবিকা আছে। তাইতো, জীবনের নাচ হয় এদের বাঁদর নাচ।

একদিকে, ঋত্বিকের অলস সংযম আর ঘোর ঔদার্য্য অন্যদিকে বিমলার বিষন্ন নিরাশ্রয়তা—তাকে তলিয়ে নিয়ে গেল। পরস্পর-বিরোধী জীবনের রাস্তাগুলো এম্নি মসৃণ, স্বাভাবিক, আর

অকৃত্রিম—যে মহাদেব বস্তু বুঝলেও না, সে মোড় ঘুর্‌লে। রং-ভরা তারল্যের ফেনা, আর স্বপ্ন-বিজড়িত ছায়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে, পাগল হয়ে' সে ছুট্‌ল রমনীরাজ্যের চিরপ্রাচীন অনাবিষ্কৃতের মধ্যে। কেহ আসে, হাসে, পেছন চায়; কেহ লীলায়িত দেহভঙ্গিমার খাঁজে খাঁজে মনকে বন্দী করেই চলে ফিরে; কেহ আনে কথা—বিফল বাতুলের প্রেক্ষাগৃহ; এ রমণীর হাটে দাঁড়িয়ে সে দেখ্‌লে শুধু অসহায় চটুল-চপল প্রাণ-নৃত্যপরা দেহসৌরভীর ভিড়! এরাজ্য ছিঁড়িয়া-ফাঁড়িয়া, হৃদয় সব ঠাট্টা-মস্করায় উড়াইয়া তুল্‌তে-তুল্‌তে তরী ওর ডুমড়াইয়া আছড়াইয়া গেল বিমলা দেবীর একান্ত নিঃশব্দ আত্মদানের ঐকান্তিত ধুন্ধুকারে আর ঋত্বিকের নিঃস্ব চির বিদায়ের অবশ নিঃশেষে।......

মন্-আমি, তোমার হাসি পাবে ঐ সময়েও এই বীর হ'বার ছল দিলে তাকে মোড় ঘুরিয়ে। এই দুটো মোচড় খাওয়া সাঙ্গ করে' তৃতীয় স্তবকের কথাটা আগেই বলেচি। কিন্তু মধ্যের কথাটাও না বলে' পারচিনা—কতটা পৌরুষের কী নিষ্ঠুরতা হলে' মহাদেব আজকার মহাদেব এইটেই সবচেয়ে আরামপ্রদ গবেষণা।

রাত্রে একটা কাফেতে বসে' আমরা তিনজনে চা পান করচি—ফাঁকে একটু একটু গল্পেরও আমেজ এসে মিলচে। মত্তপ যুবকের দলও সেই সময় আপনার অনিয়ন্ত্রিত বিস্রব্ধতায় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ সরগরম করে' তুলেচে। কোনো দল রিক্সাতে ঢুল্‌তে

ঢুল্‌তে, কোনও দল মোটরে পাক খেতে খেতে, কোনো দল পদব্রজে একঘেঁয়ে উৎসাহের বিচিত্র চমক দেখিয়ে যাচ্ছে। রমণীগন্ধের অন্ধ আবিলতায় দেহযন্ত্রের অলিতে-গলিতে নোংরা ময়লা বান ডেকেচে রাত্রির কলকাতার—বিরতি নাই; ফাঁক নাই। তৃতীয় সঙ্গী ভূপেনদার সঙ্গে তর্ক হ'চে—

তিনি বল্‌চেন - বিশ্বাসটা আদিম অভ্যাস। জ্ঞানের অপর পৃষ্ঠায় এর ঘণ্টারতি, নুড়িকে নারায়ণ ভেবে অর্চ্চনা। হঠাৎ মহাদেব কেমন আনমনা হ'য়ে' আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে— "জানেন মৃণ্ময় বাবু আমি খুনী—সত্যি হ্যাঁ, আমি খুন করেচি।"

আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাক্‌লুম তার দিকে, সে-ও সুরু কর্‌লে—

"বিমলা নিরাশ্রয়, ফণী বাবুর বাড়ির সবাই বল্‌চে, যার বাপ চায়না মেয়ের শিক্ষা দীক্ষা, তাকে বাড়ি পাঠিয়েই দেওয়া হোক্, নইলে বিপদ বাড়ে, পরের মেয়ে। বিমলার আর্ত্ত শঙ্কিত দৃষ্টি, যেন দুহাতে জড়িয়ে ধর্‌ছিল সেদিন তৃণগাছিও। সগর্ব্বে 'আত্মোন্নতি', 'সমাজ সংস্কার', 'নারী-জাগরণ' ইত্যাদি নিয়ে এমন টক্কর বাধিয়ে তুল্‌লুম এবং পরপর রিক্সাতে চেপে এমন বার হ'য়ে' পড়্‌লুম সবার সাম্‌নে দিয়ে, যে, ফণীবাবুর দলটা বিস্ময়ে-ঘৃণায় নির্ব্বোধ-বেয়াকুব বনে' গেল। কিন্তু শীতের আতিশয্যে···তখন পৌষ মাস- কন্‌কনে হাওয়ায় উৎসাহের পড়্‌তি সুরু হ'ল।

"এদিকে যতীন্, যার সহকর্ম্মিতায় এই বিমলা-পর্ব্বের এতটা অগ্রসর সম্ভব হ'ল, আর থাক্‌তে পারেনা, তখনই তার বাসায় না

ফির্‌লে নয় --অসুখ। শেষ ট্রাম---সে হেদুয়ার মোড় থেকে উঠে পড়্‌ল।

"আমি বিমলাকে নিয়ে ঐ রাতে কি করি তখন? ভাব্‌লুম, বোস সাহেব আলোক প্রাপ্ত পরিবারের মাথা, কিনারা হবে হয়তো কিছু তাঁর কাছে, অন্ততো রাতটুকুর জন্য। কিন্তু সেখানে নাকি বড় অসুবিধা সেদিন—হ'লনা। বিমলার বড় সুটকেশটা ফেলে অ্যাট্যাশি-কেশে টুক্‌-টাক্‌ জিনিষগুলি পুরে' ফের্‌ উঠ্‌লুম রিক্সায়, দুজনে। তখন পৌষের প্রথম। আমার গায়ে একটা আদ্দির পাঞ্জাবী, বিমলারও মাত্র একটা পাৎলা নীল জামা। 'রিফর্মড হোটেলে' একটা কামেরায় স্থান পেয়ে সমস্যা গেল, কিন্তু শীত গেলনা। তাব পর—পাখীর পালকের মত নরম স্পর্শ, গাঢ় নীরব আলিঙ্গন, শ্রান্ত নধর আরাম—রাত্রির শেষ হ'ল····· "

মহাদেব একটু থেমে যেন কি ভেবে আবার সুরু কর্‌লে।

"তার দায়িত্ব এমন ভাবে আমার দায় হয়ে দাঁড়াবে—ভাবিনি। কিন্তু দাঁড়াল। নানা শিল্পালয়, শিক্ষালয়, শিক্ষামন্দির ঘুরে' বিমলাকে 'সরোজনলিনী'তে ভর্ত্তি করেচি। কিন্তু সরোজনলিনী সে চায়না, শিক্ষায় তার দরকার নাই—কালেভদ্রে হটাৎও যদি তাকে দেখ্‌তে যাই, যে শুধু সজল চোখে তাকায়। এমন পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের·····কিজানি কেমন হ'ল—আমি যেন তাকে এড়িয়েই চল্‌লুম। তার দুহাজার টাকার শেষ সম্বল সে ধরে' দিলে আমার হাতে—যেন এ ভার না করে' উপায় নাই·····

টাকা ফুরুল, বছর দেড়েক কাটল, আমি তখন বিমলার কাছে একবারও প্রায় যাইনা।

"ঋত্বিক কেবলই আত্মহত্যা করেচ, তবু নিষ্ঠুর মেয়ে নীলার রক্ষার কথা না ভেবে পারচিনা। শ্রদ্ধা দিয়ে, ভক্তি দিয়েও নীলা ঋত্বিককে হৃদয় দিতে পারলে না—কিন্তু 'বুদ্ধির আলিপুর' ভূপেন নীলারত্নের অপহরণে সক্ষম হবে এ আমি হতে' দিবনা…"
ছাখো মন, এখানেও ঐ বীর হবার ছল—মহাদেব মোড় ঘুরলে। বিমলাকে বিজিত শিকারের মত একপ্রান্ত ফেলে তার শেষ কটা টাকা পর্য্যন্ত নিংড়ে দিয়ে ও ছুটল নীলারত্ন উদ্ধারে, নইলে ভূপেন কি তাকে লুটে নেবে?

ও বলে নীলাকে—"তোমার মত হৃদয়হীন আমি আর দেখিনি কিন্তু ঋত্বিকের হত্যাকারী আমি, কেন আমি তোমাকে বোঝাইনি ঋত্বিকের মত ধন পৃথিবীতে আর মেলেনা—"

নীলা ম্লান হেসে বলে—"না, ঋত্বিক দার হত্যাকারী আমি। কেন আমি………কিন্তু আমি তো কোনো বাধা দিইনি—উনি চিঠি লিখলেন, প্রস্তাব তুললেন, কিন্তু নিজেই সরে' গেলেন। …"

তারও কারণ ছিল। ঋত্বিক বুঝেছিল—নারীহৃদয় জোর দিয়ে টেনে তোলা সব চেয়ে সহজ, আর সব চেয়ে ব্যর্থ। মন্-আমি, তোমার আমার সান্নিধ্যকে অক্ষয় করব, এর ভেতরেও কি অমনি জোর থাকবে! এই জন্যই তো সরে' যাই, দূরে থাকি। জীবনের লক্ষ আকর্ষণ তোমাকে মুগ্ধ করুক, তবু তারও পরে আমার জন্য একটু নীড় একান্তে তোমার থাকবেনা কি?

মহাদেব রাগত কণ্ঠে বলে,

"তুমি মানুষ নও রাক্ষুসী, নইলে ঋত্বিককে……",

নীলা স্মিত দৃষ্টিতে চায় –

"কি করতাম মহাদেব দা… …"

আরও উদ্দীপ্ত কণ্ঠে মহাদেব বলে, "তুমি হাসচ!"

নীলা ঠুন্ করে চামচেটা পেয়ালায় ঠুকে বলে· "হাসিনি, এ চা তোমার গেছে। চা আনি।"

চা আনে, গান শোনায় আর ঋত্বিকের পাঁচালী পড়ে দুজনে — আর যা করে, তাতে………… বুঝছনা কি?

এমনি সময় নীলার জ্বর হ'ল।

রোগ শয্যাটা বড় মজার জিনিষ। যে সত্যিই আপনার তাকে আর এ সময় ঠেকিয়ে রাখা চলে না পরস্বের ছন্দা এঁকে — সব যেন কেমন বেআব্রু হয়ে ওঠে। ভাবোনা, জব্বলপুরে তোমার রোগ আর আমার……কিন্তু এমন কি হয় যে, যে কোনো কালে আপনার নয় হবে না, তার সঙ্গেও আপনার মত ব্যবহার দিব্যি মানিয়ে যায় –। অভিনয় করা যায় রোগ হলে? সিঁদেল আবেগে আচমকা হৃদয় চুরি চলে এই সময়? আমি তেমনি কিছু তোমার করিছি নাকি?……… থাক্।

আগে নীলার বর্ণনাটা করে' নিই। তোমার সঙ্গে এর যেন বেশ মিল। তোমার ভক্তি দেবদ্বিজে, আর এর ভালো লাগে পশু, পাখী, ময়না, কাঠবিড়ালী, কুকুর আর খরগোস। চোখে এর রুক্ষ স্বাধীনতা, ইরাণী যাযাবরের মত তা ঋজু আর স্পর্দ্ধিত;

তোমার দৃষ্টিতেও ঐ স্বাধীনতা, কিন্তু তার মধ্যে যেন নরম শৈশব, নীল চাঞ্চল্য। সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট এর কথার ভঙ্গী—একঘেয়ে ঝির-ঝিরে পার্ব্বত্য নদীর মত তার ধ্বনি কিন্তু অনেকক্ষণ পরে মোহ লেগে অন্তর ভরে' যায়—তোমার একঘেয়েমিতে হাসিটা নিদ্রালু বিরামের মত নতুন করে, কিন্তু নীলার একঘেয়েমি হীরের মত মত শক্ত উজ্জ্বলতায় মনের মধ্যে কেটে কেটে বসে।

নীলার অসুখ। চোখমুখ তার রাঙা, উষ্ণ, সুন্দর। চুলগুলো সুবিন্যস্ত কিন্তু নিষ্প্রভ। চাঞ্চল্যহীন কি এক মন্থরতা ব্যাকুল হয়ে আছে সারা দেহ-ভারে। মহাদেব এসে দাঁড়াল নীলার শয্যাপ্রান্তে। নীলার ইঙ্গিতে সে কাছে ঘেঁসে বস্‌ল, তার হাত নীলার কপালে রাখ্‌ল। সময় যাচ্চে, টিক্‌-টিক্‌ করে' ঘড়ি চল্‌চে—নীলা মাঝে মাঝে পাশ ফির্‌চে, কিন্তু হাতখানা মহাদেবের নিয়েই।

অনেক পরে মহাদেব বল্‌লে, 'কি কর্‌লে ভালো লাগ্‌বে নীল্‌?'

উত্তরে, নীলা মহাদেবের হাতের ওপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে' রইল বালিশের ওপর—অজস্র নয়ন-আসারে সব ভিজে উঠ্‌ল নিঃশব্দে, কিছু প্রকাশ হ'লনা—অপ্রকাশও কিছু রইলনা।

বেলা প্রায় একটায় নীলার মা এসে বল্‌লেন,

'তুমি নেয়ে খেয়ে নাও বাবা।'

'না, মাসীমা, যাচ্চি।' মহাদেব উঠে ঝট্‌পট্‌ সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

এই সময়ের স্মৃতি মহাদেবের মনোবিক্ষোভ প্রমাণ করে, কিন্তু তাকে নৈতিক দ্বন্দ্ব বলা চলেনা বোধ হয়। শুধু বুঝি, ওর বকের পাখা ঠিক ও ধুয়ে পুঁছে শাদা করে' তুল্‌তে পার্‌চেনা।......

এবার মহাদেবের কথা শোনো।

"বিমলা কি আবেগে আমায় চেয়েছিল? আর কি-ই যে আমার হয়েছিল? চলে' এলুম চিরদিনের মত আর ওর মন যোগানোর *জন্য* এগিয়ে দিয়ে এলুম সতীশকে।......চেষ্টাও কম করিনি ওকে বিয়ে দিয়ে সুখী করে'......বালিয়া জেলার শ্রীকুমার বর্ম্মণ এম, এ ওকে দেখে নার্ভাস হয়ে' উঠ্‌ল—বিয়ে কর্‌বে; ও খোলামুকুচির মত তা' ভেঙে দিলে। তাইতো সতীশকে পেয়ে যেন আমাকে খুঁজে বেড়াবার যন্ত্র হাতে পেল। বোস্ সাহেবের মেয়ে নীলার কাছে আছি জেনে একবার সেখানে, আর একবার 'নিকেতন' আপিসের দোতলায় ও আমার জন্য তিন মাস ঘুর্‌ল। একদিন শুন্‌লুম আত্মহত্যা করেচে।"

মহাদেবের মাথাটা একটু নুয়ে পড়্‌ল। প্রশ্ন কর্‌লুম, 'হটাৎ।'

মহাদেব বল্‌লে—

"হটাৎ নয়। 'সরোজ নলিনী' আর সতীশে ওর হ'লনা, ও পার্‌লে না। ঝির হাত দিয়ে আপিম এনে খেলে। ক্যাম্‌বেল হাঁসপাতালে চেষ্টা হ'ল ঢের। কিন্তু হ'লনা কিছু। মরবার

আগে ঠাণ্ডা ঘর্ম্মাক্ত হাত দিয়ে ডাক্তারের হাত চেপে ধর্‌লে, কি যেন বল্‌তে চাইল, হ'ল না।……”

আমি বললুম “কার কাছে শুন্‌লেন?”

“সতীশ! কি করে' ঠিকানাটা পেয়ে, ডাক্তারের খোঁজে পাগলের মত হয়ে' তার বাড়িতে গিয়ে ও শুন্‌লে বিমলার মৃতদেহের সৎকার হ'য়েচে। নিশ্চিন্ত হ'ল। বিষাদের ঘোরে দিন কতক এলোপাতাড়ি সতীশ বাইকে ঘুর্‌ল আর অপরাহ্ন, রাত্রি, গভীর রাত্রি করে' বাড়ি ফির্‌ল!……সতীশ বিমলাকে ভালো বেসেছিল।……”

ইদিকে গুলি-খাওয়া কুকুরের মত ভূপেন ঘুর্‌চে। নীলাকে জয় কর্‌তে না পেরে ও ক্ষেপে উঠ্‌ল দিন দিন। কেবল বকে। বলে, নীলার চেয়ে রূপবতী গুণবতী এক লরি মেয়ে ও এখুনি সারা কলকেতা ঘুরিয়ে আন্‌তে পারে, সবাইকে দেখিয়ে। কখনো বলে, ভালো লাগেনা মেয়ে—সেই রং, সেই ক্রীম্, সেই ন্যাংচানি, সাড়ি—ছোঃ এম্‌নি করে' কিছু দিনে বৈরাগ্য তার শেষ হ'ল—একটি বেশ্যা আর এক মদ্যপের সঙ্গে আর সান্নিধ্যে।

দিন আট পরে। 'নিকেতন' আপিসের ওপরের ঘরে গিয়ে দেখি একটা জীর্ণ ইজিচেয়ারে মহাদেব অকাতরে ঘুমুচ্চে। আদ-ময়লা পাঞ্জাবিটা খুলে রেখেচে টেব্‌লের ওপরে। এলোমেলো চুল থেকে কপাল অবধি ক্লান্তি আর ঘাম। গেঞ্জির বুক খোলা, সাম্‌নে দুটো পয়সা, একটা আধপোড়া বিড়ি, আর একখানা অপরিচ্ছন্ন রুমাল।

যে মহাদেব দুই‌বেলা দুই রকম ভোল ফিরিয়ে, রং বদ্‌লে সভ্যতার জোয়ার ভাটায় পাড়ি জমায়, তার এই কঠিন দারিদ্র্য! না কৃচ্ছ্রতা! না ঔদাসীন্য! না সবই!

মহাদেব বিবাহিত। ওর স্ত্রী আছে, এখনও তার চিঠি ওর বাক্সের বিশেষ স্থানে গন্ধ মেখে জমা হয়। কি কর্‌বে মহাদেব এখন? নীলার প্রেম চুম্বকের মত টেনে ধরে, বিমলা-প্রেমের মত তা' আত্মদানের শুধু নয়। এই প্রেম! তার পরও যে আছে! প্রেমক্ষেত্র জটিল রুচিক্ষেত্র ধরে' ভাঙা-চোরা জোড়া-তাড়া দিয়ে উঠ্‌বে কি করে'। ও কস্যাকদের জীবন জান্‌ত, আধুনিক মার্কিনী হট্-ব্লাড্ ওর চেনা, কিন্তু পশ্চিমী কায়দা ওর রপ্ত হ'ল কি? দেখা যাচ্চে ও ভারতবর্ষীয় সামন্তী যুগের লোক—পোষা প্রেম, দুটি অন্ন আর অল্পবিস্তর মধ্যবিত্তের ভাগের পোঁ-ধরা বা গোঁ-টানা না হলে' ওর নয়! কি করবে তাহ'লে এখন?

ওর বর্ব্বর অন্তরে সত্যানন্দী শুদ্ধি আন্দোলন হয়ে' নতুন উপদেশ নেমেচে, কিন্তু মূল পাচ্চেনা ওর হিসাব খাতায়! ও সন্নিসি হবে না তো? ভবের হাটে ও এখন কি নিয়ে খেল্‌বে, খেলার দেয়াল ভেঙে ওর ঘাড়টা যে ভেঙেই গেছে!

তুমি ভেবো। কিন্তু গোটা কয়েক নিভাঁজ কড়া উপদেশ না দিলে আমার কথা ফুরুচ্ছে না।

এক নম্বর—স্বাধিকার-স্পৃহা পুরুষের ধাতুগত ব্যাধি, অধিকার কর্‌বার পাটোয়ারি বুদ্ধি বা বলকে প্রেম মনে কর্‌লে ঠক্‌তে হয়।

নম্বর দুই—পৌরুষ বল্‌তে সক্রিয় ষণ্ডামি নয়, জোর দিয়েই হোক্, আর ক্যাংলামি করেই হোক্ হাত পেতে নেওয়া পুরুষের পেশা নয়—এ পুরুষ চেন্‌বার আনন্দ আছে।

নম্বর তিন—লোভীর মত প্রেমের খাদ্যভাগেই যাদের দৃষ্টি তাদের পেট ভর্‌তে পারে—কিন্তু ভরা পেটের গাবমি-বমি একদিন আসেই, সব দেশে, সব কালে, কোন না কোন সময়ে।

নম্বর চার—প্রেমের পূর্ণতা প্রতিভার ঐক্যে;—যৌন তৃপ্তি সস্তা কিন্তু প্রতিভার পরিণতিতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

আচ্ছা এই পর্য্যন্ত আজ থাক্—

ইতি—

তোমার মন—

পুনশ্চ। কোন কিছুর দালালি কর্‌ব। দালালি ছাড়া এ যুগে কাজ নাই। বোধ হয় শীগ্‌গীর হবে।

মন্—

২ পুনশ্চ। মহাদেবের ফোটো কাছে আছে আমার। পাঠাব। আর একটা ফোটো আছে সেটী তোমার—কোলে তোমার নিমু—আমি ভাবি ও তোমার, ও নিমু নয়।

মন্

রচনাকাল
কলিকাতা, ১৯৩৩।

মির্জ্জাপুর, বির্ল্ডিংস
কলিকাতা।
জুলাই, ১৯৩৫।

মন্ আমি,

ক্রমাগত একমাস ধরে মোটা পেট রায় সাহেবকে ভজাচ্ছিলাম, তিনি কেন স্ত্রী-পুত্রের অন্ন সংস্থান করছেন্ না, বিধাতা না করুন চোখ্ বুঁজতে আর মানুষের কতক্ষণ; আমাদের কোম্পানিটার বয়স বীর্য্য, দানশক্তি কোনোটাই যে মাত্রাতিরিক্ত ছাড়া নয়, এবং জীবনে সুবিধা আজ আছে কাল না-ও হ'তে পারে যে, কিন্তু রায়সাহেব না দেন জবাব না করেন রাগ, অথচ আমল দেন না এতটুকুও……কিন্তু আমিও নাছোড়, যে হেতু এখানকার ওঁরা নাছোড় এবং তোমরাও………যাক্ গে; তিনি বাগ্ মেনেছেন, টাকা তাঁর পাঠিয়ে দিয়েছি, একেবারে ১৫০০০৲ টাকা মূল্যের বীমা তাঁর ঘাড়ে গতিয়ে, আর বলে' এসেছি, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এর জন্য একদিন আমার দিকে চেয়ে আশীষর্ব্বাদ জানাবেন………

আজ সকালে আমার টাকাটাও হাতে এলো, সঙ্গে সঙ্গে ওজনটা আমার যেন হালকা হ'য়ে গেচে; ভিখিরীটাকে দয়া কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। ঐ মুখশুক্‌নো লোকটা, উমেদারই বটে 'আহা', কুকুরটা

জিভ্ বার করে' হাঁপাচ্ছে 'আহা',.........এম্নি 'আহা' দিতে-দিতে অচ্ছন্নের মতো একজন ভদ্রমহিলারই ঘাড়ে গিয়ে পড়ছিলুম আর কি! ইনি কেন যেন জানিনা তাকিয়ে হেসে চলে' গেলেন। কিন্তু সে চাউনি যেন ঠিক তোমারই চাউনি, সেই তুমি যেমন বলোনা, 'দূর্ ছাই ও আমার ভালো লাগেনা'—আর উল্টো করে' 'ভাল লাগেনাকেই' ভালো করে' চাও—তেমনি। আমি কিন্তু সেই তোমারই ভালো-করে'-চাওয়াটার পিছনে ছুট্লুম। ইত্যবসরে মহিলাটীর কথা মনের কাছে খানিক বৃথাই গুণ্ গুণ্ করে' গেল। ....দেখ এই ক'দিনের জ্বালায় প্রায় বৈদান্তিক হয়ে' পড়ছিলাম্ আর কি। আজ এইটেই আস্‌ছে সবার আগে এগিয়ে।

তোমার বাপের বাড়ী বীরভূম, অনেক রকম মোরব্বা মেলে, একথায় আর চিঁড়ে ভিজেনা—মোরব্বাটা আমার যা' ভালো লাগে ....খাদ্যই, অথচ খাদ্যের জমকালো ভাবটা নাই—খুব খাবো, আর তোমায় লিখ্‌বো, কি হচ্ছে, কেমন হচ্ছে, কি হওয়া উচিৎ এই সব......

তুমি এখন পূব ঘরটাতে চুপ চাপ শুয়ে আছ এ আমি দেখ্‌তেই পাচ্ছি। ওপাড়ার পদী পিসি শাক বেচ্‌তে এসে 'মা', 'মা', করে' হাঁক-ডাক সুরু করেছেন। এদিকে খোকাটা মেজেতে হাত চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে হয়রান হয়ে গেছে। এইবার চোক ডলছে ঐ-যা, কেঁদেই ফেল্‌লে, দেখেচ, ও কাঁদ্‌লে আমার যেন ওকে আরো কাঁদাতে ইচ্ছে করে, ভারী আমোদ্—মনে হয় ওর ছোট-ছোট আঙুল গুলো মটামট্ মটামট্ ভাঙি আর ও কাঁদুক—

আর তুমি ভাবচ আমি কি নিষ্ঠুর। তা ভাবোগে…………
এইটাইতো ব্যবধান, অপরিমেয় হ'য়ে আছে যে এ!

তোমার থেকে আমার যে ব্যবধান সে তো কতকগুলো মাইলেরই নয়; সে যে আরও অনেক কিছুর, অনেক কিছুর। সেই সেদিনটা মনে করো। বর্ষার রাত, গ্রামের উপর ব্যাংগুলো ঘ্যানর্‌-ঘ্যানর্‌ করচে, এবং তাদের নাম যে "দাদুরী" হ'তে' পারে এমন একটা আভাসও দিচ্ছে। তুমি আর আমি চুপ করে শুয়ে বিছনার এপ্রান্তে আর ওপ্রান্তে। প্রথম সম্ভাষনের এই মোহনায় এসে জমেচে কত ভয়, কত বেদনা, কত দুর্দ্দমিত-বল, প্রেরণা, ভাবনা, কামনা। এটা কেন জানো? কিন্তু তার আগে বলে' নিই বীমার এজেন্টের এ স্বপন-বিলাসই বা কেন?

আছে, আছে, হেতু আছে। জীবনটাকে যখন চলতে বল্‌বার জন্য ক'রে' উপদেশ দাও তখন স্বপনটাকে পিষে মার্‌তে চেয়ে ভুল ক'রোনা! জীবনের মত এম্‌নি একটা প্রচণ্ড প্রকাণ্ডতা, যে দুহাতে লুট্‌তে চায়, ভেঙে-চুরেও যে বাঁচবার জন্য আঁচ্‌ড়ে-কামড়ে রক্তপাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, তাকেই যখন আবার দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে একটুক্‌রা স্বপ্ন নিয়ে—একটা অন্ধ বর্ষারাতের বোবা মূর্খতা, একটা খাপে-ঢাকা ক্ষুদ্রকায় বসন্ত-বিহ্বলতা—তখনই তো বুঝি এ স্বপ্নের বালুচরে যতই আশঙ্কিত চাপল্য আর উন্মুখ ঝরে'-পড়া লুকিয়ে থাক্‌, এরই উপরে দাঁড়িয়ে চলেই ওই জীবনটা। জীবনের জীবদেহকে ভারী করে' তুলতে আর পারিনা, তাইতো স্বপনের চাকা-দুটোকে ঘষে' ঘষে' দেখি, এখনো এ সেই ভারী

জানোয়ারটাকে চল্-চল্ করে চালিয়ে নিতে পার্বে কিনা। দেহের দাবীতে দুর্দ্দম স্বাস্থ্য নিয়ে পৃথিবীর বস্তু আর নারীকে শুষে' নিতে নিতে সুখী হ'তে চাওয়ার ভিতরে আছে এতবড় একটা পালোয়ানি এবং এম্নি জোর ঘেমে-নেয়ে-ওঠা, আর হাঁস-ফাঁস্ করে' ওঠ্বোস করা যার কথা ভাব্তে গেলে আমার লোভকেও ছাড়িয়ে ওঠে আমার দুর্ব্বলতা—যে শুধু চায় সামন্য একটু খানি সুখ, সামান্য একটু খানি বন্ধন, যা নিয়ে উৎসাহে হাস্বে, উত্তেজিত হবে, আর জীবনটাকে মুক্তি দেবে সহস্রধারে। কত হৃদয়েরইতো পাশ দিয়ে, কিনারা ঘেঁসে, কাউকে ছুঁয়ে, কাউকে ধরে', কাউকে বুকে করে' এই দীর্ঘ পথ এসেছি, কিন্তু এমন করে' বন্ধন কোনো-কালেইতো প্রার্থনা করিনি!

তুমি বলো, আমি তোমার কথা শুনিনা, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো করে' আমি বলি, তুমি আমাদের দুজনের কথা শোনোনা; নইলে ফাঁকি দিয়ে ফাঁক বন্দ করতে চাইবার মত মূর্খতা আসে তোমার কোন লজ্জায় বলোতো! যে-আইনে তোমার সাথে আমার বিবাহ হ'ল সে আইন কি তুমি মনে করো শুধু সম্বন্ধ রক্ষা করেই খুসি হবে, অথচ সে খুসিতে সে চাইবে না এবং চাইতে অধিকারও দেবে না। বরণ করা হ'ল অথচ সম্বরণটাই হবে তার শেষ কৌতুক; হাসি পায়—এ যেন মালাবদলের মালাই রইল হাতে মানুষটা গেল কোথায় আলাদা হয়ে' অসাড়ে। কিন্তু সে-দিনের সেই প্রেরণা, কামনা, ভাবনা, ভয় কি চাইছিলো, কাকে চাইছিলো এইবার বলোতো? সুধা! সুধা! মন্-আমি, আর

কিছু নয়। দেহ-মনের রোমাঞ্চিত কামনায় যৌবন-ক্ষুধা সে দিন ক্ষুধা ভুলেছিলো, তাইতো কোনোরকমে একবার বক্ষ-লগ্ন হওয়াটাই তার একমাত্র প্রত্যাশা ছিলোনা। প্রতি শোণিত বিন্দুকে নিয়ে প্রতি শোণিত বিন্দুর যে উন্মাদনা তাকে ভাঙিয়ে অনেক অনে—ক দূর নিয়ে যেতে পারতাম আমরা দুজনে যে! ক্ষুধাকে অস্বীকার করছি না, দেহের প্রতি কণিকার স্পর্শে প্রতি বিচিত্র স্বাদ ও ভুলিতে চাই না, কিন্তু ওটা যার ফুল তার ফলটা যে আজও অদৃশ্য, মন্-আমি!

এই নরদেহের প্রতি ত্বগস্থি, মাংস চর্ম্ম, বৃথা-পূজারী মুণ্ডমালা-ধারীর দৃষ্টিতে শুধু ঝরে'ই হবে লয়, ভেঙেই হবে ক্ষয় এতো তুমি আমি কেউই চাইনি। সেই যে আড়ম্বরহীন ছোটো একটু আসন পেতে দিয়ে ছোট একখানা থালা এগিয়ে খেতে বস্তে বলা—সেই একটুখানি সংসার, আনাচে কানাচে তার কত অসুবিধা আর অগোছালতা। এ স্মৃতি নিয়ে আজ মনের কাছে হাঁক-ডাক করে' কাঁদতে বসতে চাই না; কিন্তু ভুলতেতো পারিনি এই কঠিন-কঠোর প্রতিযোগিতা-ক্ষুব্ধ পৃথিবীটার, কত দীর্ঘ পরিশ্রান্তিই তাতে ভুল্তে পারতাম! বাঁকুড়া সহরটা তোমার কাছে সে দিন নতুনই বটে, সেই লাল কাঁকর-চাপা পথ ঘাট, ধমকে-ধমকে সূর্য্য-কিরণ এসে ঝল্‌কে যাচ্ছে। রক্তাভ শীর্ণ শুষ্ক বালু, আর ক্ষীণ নদীরেখার উপরে দু একটা তালের বন, এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে……… অনেকক্ষণ বাদে চলচে এক-আদটা চাষী, মুখে তার কালো ঘাম চোখে তার ঘন কালি; পেটে তার বাংলা দেশের স্বাস্থ্য বিবরণী।

আমাদের বাংলোর ধারের সেই স্বর্ণ চাঁপার তলায় এসে কত সব যে বসত এরা। কী প্রাণ পণে এরা হুঁকো টানে, যেন মনে হয় ঠিক অম্‌নি করে' না টেনে নিলে এরা এখ্‌খুনি টাল খেয়ে পড়বে, কি অসাড়ে এরা অশিষ্ট আলাপ আর ইঙ্গিতে দিব্যি সাম্য রাখে, যেন এ আলাপগুলো মর্ফিয়ার কড়া ডোজ, খাওয়া চাই-ই যে, নইলে টলে' পড়বার কৌতুক তৈরী হয় মাঠের মাঝখানে—। কিন্তু সব চেয়ে বৈশিষ্ট এদের মৃত্যু। কবর খুঁড়্‌চে তার শব্দও নাই। লোকগুলো চল্‌চে ঘুরচে ইদিক-ওদিক কাজে-অকাজে বা বৃথা উৎসাহে তারা আছে, কী নিস্তব্ধ ছন্দ, আর কী বিরাট অসাড়তা—। মনে পড়ে!—আমি বলেছিলুম, গরু-মোষগুলো দ্যাখোনি, কেমন ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে, চেয়ে থাকে তাদের বাছুরটাকে যখন দড়ির কষণ্‌ দিয়ে সাইড্‌ করে' নিয়ে যায় দৈত্যের মতো লোকগুলো মাজা পর্য্যন্ত কাপড় তুলে' ধরে', তুমি চম্‌কে উঠেছিলে।

কিন্তু থাক্‌······

প্রথম সম্ভাষণের কিনার ঘেঁষে এই যে রোমাঞ্চিতরূপ মনন আর অনুভবের জটলা, আর মনকে চোখ্‌-ঠারা, তা যদি বলি ক্ষুধা-পুর্ত্তির চতুষ্পদীয়তা মাত্র নহে, আকাঙ্খা সমুদ্রের রক্ত কমলের স্বর্ণবর্ণ মানবীয়তাও বটে, তবে কি তা' মেনে নিতে চাইবে না। কম করে' তো জানিনা, প্রেম কথাটার অতি বড় অর্থেও তা বিদেহ হ'য়ে কখনো ওঠে না, বরং উঠ্‌লেও তাকে প্রতাড়নাই বলা নিরাপদ, এবং আমরাও মানুষ বল্‌তে নিজেদের পশুত্বের থেকে

খুব বেশী কয়েক সিঁড়ি এগিয়ে গেছি এমনও তো ভাবতে পারি না, তাছাড়া, অসম্পূর্ণ অভ্যাসের এলোপাতাড়ি ধড়-ফড়ানি, আবেগ আর আব্হাওয়ার মগজবিহীন পোঁধরে' থাকা, সমাজের ভিতরে থেকে সামাজিক পশু আমরা খুব বেশী যে তাড়্তে পারব তা-ও নয়, তবু ভাবতে চাই, এ পশুত্বের প্রাণধারণের মধ্যে অন্ততো মানুষকে পাশবিকতায় কামড়াচ্চেনা, সে অভ্যাসগুলাও তাঁর লহলহ জিহ্বায় আর মানুষগুলাকে গিল্তে আসচে না। পশুত্বের পোড়ানিতে চিঁ-চিঁ করে' সে উঠুক, কিন্তু পাশবিকতার ঘোরে সে খ্যাঁক্ করে' কামড় না দেয়—এবিশ্বাসটুকুও কি চাইতে পারোনা আমরা মানুষ !

কিন্তু দেখেচ আসল কথা থেকে সাতশো গজ দূরে এসে পড়েচি, না হিড়্-হিড়্ করে' কে যেন আমায় টেনেই এনেচে একথাটা যে মানুষটার তারই আঘাত সামলাতেই যেন আমি এতক্ষণ ধরে বক্তৃতাবীর সেজেছিলুম। প্রবৃত্তির সঙ্গে আপোষ করাই এই দামী মানব-প্রতিভার শেষ উৎকর্ষ, কথাটা হবে হয়তো সত্যিই বা।

এ লোকটাকে তুমি দেখেচ, তবে অন্তর দিয়ে ছাখনি, ঠিক-নারী ঠিক-পুরুষকে যেমন করে' দেখে তেমনি করে' দেখতে পারনি ; একে অম্নি দেখলে আকর্ষণ না এলেও উন্মাদনা আসেই এবং সে উন্মাদনার থেকে মানুষটার একটা খস্ড়া পরিচয়ও মেলে' চোখ্, কান, পায়ের শব্দ ইত্যাদির ভাষা থেকেও বোধ করি। তবে এর প্রতি তোমার মনের উন্মুখতা কেমনতরো ছিলো

বা ছিলোই কিনা এ-ও আমি খুব জানি বলে' বড়াই করছি না অবিশ্যি। আসল কথা, লোকটি তোমার মনের বা দেহের আয়নায় কেমন ফুটেছিল না জানলেও এই বলেই ভূমিকা করি, যে, যেকোনো ধীশক্তিশালী রমণীর একে দেখলে স্বাদ লাগবে অন্তরের কিনার দিয়ে এবং যদি আকাশের চাঁদ বলে, হতাশ তুরা-কাঙ্খা না তার টুঁটি ভেঙে দেয় তা হলে' সে মাথা উঁচু করে ছুটবে এর কাছে, এর মন ভোলাতে আর ছলা করতে—অবিশ্যি এ-দেখা অর্থে আমি দেখাদেখি এবং মেশামেশিও বুঝচি কিন্তু।

এর চেহারায় একটা সুস্পষ্ট সাধারণতা আছে তাই তোমাদের জাতির চোখে পড়তে এর বেগ পেতে হবে। কিনতে গেলে যেমন বাজারে জিনিস কিনতে চাওনা তোমরা, মুগ্ধ হ'তে' গেলেও তেমনি তোমরা বাজার-দরে মুগ্ধ হওনা; কিন্তু একটু স্থির হয়ে দেখবার অবকাশ পেলে দেখতে এর চোখে রঙীন কবিতা। এ বস্তুবাদী বটে, এবং এ বস্তুবাদের ছন্দহীন শ্রী আর নিষ্ঠুর কার্কশ্য এর অমার্জ্জিত এবং কতক পরিমাণে অশিষ্ট বাক্যালাপে ঝটপট্‌ ব্যক্ত হয়ে'ও পড়ে বটে—তবু তার তলদেশের সেই কবিতাকে ধন্যবাদ—যে-কবিতা, যে-স্বপ্ন এর সমস্ত বস্তুবাদকে এর ভিতরে থেকে কোনো স্ববিরোধী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে' তোলে নাই। বস্তুবাদীর তো এযুগে অভাব নাই, কিন্তু কী অসহায় তারা, তাদের দুঃখে নাই গভীরতা, সুখে নাই প্রাণভরা জান্তব আকুতি, জীবনে নাই বেগ, মরণেও নাই পক্ষপাতিতা। এ কবিতা এর সহজ সুখের সুস্পষ্ট চেহারা, এ বেশ জানে এর যদি বিশেষ ধরণের

আবহাওয়া আর বিশেষ ধরণের সঙ্গ আর আসঙ্গ আসে এ সুখী হবে। কিন্তু এ অবোধ প্রাণীটি, যে এরই সন্ধানে বেরুবে সে অবকাশও এর নাই, কারণ কেউ ওকে ছোট ভাব্‌বে এমন ভাবের থতমত খাওয়াকে ও সবচেয়ে করে ভয়—যেমন একদল লোক আছে যারা বাজারে বেরুলে ঠকে' আস্‌তেও রাজী, কিন্তু দর যাচাইএর অসুবিধা বা অপমানকে কাঁধে নিতে রাজী নয়। তোমার নিশ্চয়ই মনে হচ্চে আমার কথা, আমি এ অপমানকে ভাব্‌তে পারি না, তুমি বল্‌ছিলে গ্রাহ্য করি না, হবে হয়ত। তবে এটা ঠিক যাদের কাছ থেকে অপমানের ভয় এ করে তাদের খুব উঁচু আসনেই এ মনে ধরে' রেখেচে, আর আমি হয়ত সে উঁচু আসনে রাখ্‌বার না পেয়েচি স্বপ্ন না পেয়েছি বাস্তব। তাই বলে' জীবনের সম্বন্ধ ধারণা এর বড় কাজের লোকের মত।

আমাদের দেশের গ্রাম্য মেয়েরা নারীর যৌবন বল্‌তে বোঝে রমণীর উন্নত কুচযুগ, তাই অবনত কুচযুগকে সেখানে অবহেলা করবারও অবহেলা, অনুন্নতকে উন্নত কালের রোমাঞ্চ দেখিয়ে চাঙা কর্‌বার এত সতর্কতা। এ যুবকটীর, নাম ভবেশ, জানোতো, ধারণাগুলাও প্রায় অনুরূপ। দাঁত থাক্‌তে দাঁতের কদর না বোঝার যে আক্ষেপ বার্দ্ধক্যে, সেই আক্ষেপই প্রণয়াভিযানের খামোকা-ভাবনা, খামোকা-কুণ্ঠা আর খামোকা-রঙ-সৃষ্টি করায়; দাঁত দিয়ে চিবোনো আর প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার একই সমস্যা, পরিবর্ত্তনে তাই এর সুখ আর সহজ হওয়া এবং গোঁড়ামিতেই তাই এর স্বাস্থ্যশ্রীর নিষ্ফল হত্যা। স্পর্শের যে-ছন্দ, যে-রোমাঞ্চ

মন্প্রাণের অনেক দিনের অজানা স্পন্দনের ও কারণ হ'তে পারে এর কাছে তারো চেয়ে বড় কথা তার সত্য হেতুটা—অর্থাৎ ও ছন্দের কারণ আছে তাদেরই যাদের আছে অসহায় ভীরুতা, আর অনভ্যাসের অতিপ্রবণতা। অর্থ যার নাই সত্যিই, তাকে অনর্থক রঙ দিয়ে অর্থপূর্ণ মনে করার এতটুকু ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই এর— তাইতো এ যখন ব'লে বস্তুবাদী কখনও কারও সন্দেহের সুযোগ নিতে চায় না অপমান বোধ করে, তখন এর উলঙ্গ ভাবরূপ দেখে আমি বল পাই, কারণ ও বল আমার নাই। সন্দেহ করে' সুযোগ দিতে হাজারো বার তাইতো চাই। মনকে চোখ ঠেরে ফাঁকি দিয়েও যদি কিছু পাই, এটুকু হিসেব আমার ধাতুগত; সাড়া পেলে আর ইসারা না করে ছাড়িনা যদি কিছু উঠে আসে এ-ইসারাকে অবলম্বন করে'।

ইত্যবসরে আবার বল্‌তে সুরু করি যা বল্‌তে যাওয়াই এ চিঠির আসল হেতু·········ভবেশের সম্বন্ধে এতক্ষণ তোমার একটু কৌতুহল হয়েচে মনে কর্‌তে পারি জন্যই এর জীবনের মাত্র দু-একটা ঘটনা বল্‌ব, অবিশ্যি, অম্‌নি ঘটনা আমি কি ভাবে নির্ব্বাচন কর্‌লাম তারই উপর নির্ভর কর্‌বে, এই চরিত্র আমি কি সত্যই সত্য করে' তুল্‌তে পেরেচি, না, না। কৈফিয়ৎ দিয়ে একটী কথা বলি শুধু, যে আমি এ চরিত্রকে ঠিক দেখবার চেষ্টা করেচি, আহ্লাদে ফেঁপেও উঠিনি বা হিংসায় হাঁসফাঁসও করিনি দেখ্‌তে গিয়ে, বেশ ঠাণ্ডা হয়ে, কেতাবের মতনই একে পাঠ করেচি।

সন্ধ্যের পর থেকে সে দিন বেশ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়েছে; কল্‌কাতার ওপর একটা জলো-ছাওয়া পাত্‌লা হ'য়ে' জমে আছে তখনও, গ্যাসপোষ্টগুলো বোবার মত চোখ মেলে আছে, গড়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা দুজনে চলেচি। পথ জনবিরল। মাঝে মাঝে দুয়েকটা নিসঙ্গ সঙ্গপিপাসুতা, মৃদু সরস আলাপ। ভবেশ ডালমুট কিনে নিলে, সেগুলো দুজনে চিবুচ্ছি, এম্‌নি সময় সে সুরু কর্‌লে পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-সঙ্গিনীর মাহাত্ম্যবর্ণন। পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্ব হয় এক বুদ্ধির সেয়ানাপনায়, তা আবার সামঞ্জস্য না থাক্‌লে টেকেনা। হয় একপক্ষ মুখ কাঁচু-মাচু করে ছিট্‌কে পড়ে না হয় মুচ্‌কি হেসে ধীরে নাগালের বাইরে সরে - আর রমণী-সঙ্গের এম্‌নি রমণীয়তা যে প্রতিমুহুর্ত্তের মধ্যেও সব প্রলাপ-বাহুল্যকে রঙে্‌-রঙ্‌ করে' দিয়ে যায়। আমাদের মত লোকও তাতে অনেক সময় সাম্‌লে নেয় নিঃশব্দে।............"থাকগে, শুনুন, দিনকতক ভারী একটা অসুবিধায় পড়েছিলুম, একটা মেয়ে আমায় বড় কষ্ট দিত। প্রত্যেক রাত্রে যেতাম তার কাছে; সে কিন্তু জেগে থাক্‌তে পারতনা, আস্তে আমার কোলে মাথাটী রেখে ঘুমিয়ে পড়্‌ত, আমি থাকতুম জেগে ঠিক সময়ে বেরিয়ে আস্‌তে হত বলে।............"

মন্দ লাগেনা অমনি রমণীর নিস্তব্ধ-শ্রী-টুকু। বুঝলাম বর্ষা ভবেশের মধ্যে 'আজকে কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে',—জাগিয়ে দিয়েছে। যা-ই হোক কিছু পরে আবার সে এই ঘটনাটা বিবৃতি কর্‌তে বস্‌ল।............

"কাকাবাবুর অসুখ; তিনি এ্যালোপ্যাথি ছেড়ে যখন হোমিওপ্যাথি সুরু করলেন দিন কতক কব্‌রেজী বড়ি দুচারটা খেয়ে, তখন বুঝ্‌লাম মাথা তাঁর খারাপ হয়েছে, এবার হয়ত দৈবশক্তি······বা হরিনাম বা ধন্নাও দিতে কোথাও আরম্ভ কর্‌বেন; জ্যাঠা মহাশয়কে জানানো সঙ্গত বোধ হ'ল, তিনিও কাকাবাবুকে এসে নিয়ে গেলেন—ইদিকে ঐ বাড়িতেই কয়েকটা ছেলে মেয়ের মধ্যে একটি অল্প-বিকাশ-পর অথচ বয়স হয়ত বারো তেরই হবে বা, মেয়ের হাত দেখ্‌তে বসে' (অবিশ্যি এটার অর্থ ছিল সময় কর্ত্তন—হাত-ফাত দেখা আমি জানতাম না) আমি বলেছিলুম 'তোমার পঁচিশটে বিয়ে'। শুনে, মেয়েটীর ভেতর বেশ একপ্রকারের মৃদু রোষের খেলা চক্‌মকিয়ে গেল। একটু দূরে আর একটী আধঘোমটা পরা বধূ খানিকটা স্পষ্ট করেই বল্‌লে—'ইচ্ছে হ'লেই, মেয়েদের পঁচিশটে বিয়ে আর হবে কি করে ভবেশ বাবু।' আমি একটু চোখ উঠিয়ে তাকালুম মাত্র এবং তার পরে চুপ কর্‌লুম।······"

আমি বললুম, "মেয়েটা আচমকা তোমায় অম্‌নি বল্‌লে?" ভবেশ বল্‌লে, "আরে ছাই এর আরো দিন কতক আগে অমনি কেমন যেন একটু একটু অগ্রসর হচ্ছিল"। "কিন্তু তুমি চুপ করে রইলে কেন?" ভবেশ বল্‌লে "আমি ওর পরেও চুপ করে ছিলুম অনেক ঘটনার পর; শুনুন। কি একটা ব্যাপার সে দিন ঐ বাড়িতে আমার রাত্রি বাস কর্‌তে হ'ল। দোর বন্ধ করবার কোন প্রয়োজন না বুঝে দোরটা খুলে রেখেই বিছানায় পড়ে' আছি

আনমনে। আমার ধারণা আমি ঘুমুচ্ছিলাম না কিন্তু লীলার কথা আমি ঘুমুচ্ছিলুম, যাই হোক্ এমন সময় যেন একখানা মুখ আমারই মুখের উপর ঝুঁকে পড়্‌চে ; অল্প অল্প জোছনার আলো, তবু বুঝ্‌তে পারলাম সেটা কোন মেয়ের মুখ—এরকম একটা ঘটনা নেহাৎ মন্দও লাগ্‌লনা। চুপ করেই আছি তবু। মেয়েটা অম্‌নি কিছুক্ষণ থেকে—সে বলে, আমায় নাকি আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এসেছিল দেখ্‌তে, এবং তার পর আমায় নাকি তার খুব ভালো লাগ্‌ছিল তাই চুমোও দিয়ে ছিল মুখে……” এইখানে ভবেশ হেসে বল্‌লে এটা সে কিছুতে বিশ্বাস করে না, তাকেও নাকি কারুর ভালো লাগ্‌তে পারে……ভবেশের রূপটার বর্ণনা আর একবার আমার মুখে শুন্‌বে মন্‌-আমি—? ভবেশ শীর্ণ-আকৃতি-মলিন বর্ণ তবু শক্ত, নড়বোড়ে নয়…… টিপ্পনী থাক্ ভবেশের কথাই শোন—“যা-ই হোক্, মেয়েটা হটাৎ কাঁদতে স্বুরু কর্‌লে ঝপ্ করে' ঐ বিছানার একধারে বসে ; আমি চুপ করে আছি দেখে সে-ই কথা স্বুরু কর্‌লে—'আমায় তুমি উদ্ধার কর, আমার বড় কষ্ট,' ইত্যাদি, ইত্যাদি ; আমি বল্‌লুম, একরকম কান্নাকাটিতে আমি কি বল্‌ব বা, কর্‌বই বা কি, এমনি করা একেবারেই ভাল না, কেউ এসে পড়লে সমূহ বিপদ। সে চুপ করলে, কিন্তু সে আমার ইচ্ছায় নয় তার খুসিতে। এর পরে সে চেয়ারে উঠে গিয়ে বস্‌ল এবং বসেই থক্‌ল। শেষে সে আমার পাশে এসেই সটান হয়ে দাঁড়াল এবং আমি তাকে ক্রমাগতই বোঝাতে লাগলুম, এটাতে বিপদ আছে।

"ইতিমধ্যে বাড়ীর অন্যদিকে দোর খোলার শব্দ হ'ল আমি বুঝ্‌লুম একটা কিছু ঘটাবে এবং আমি বেশ উত্তম-মধ্যম খাব এবং নিঃশব্দেই খাব তা-ও জানি। লীলা কিন্তু দোর-খোলার শব্দের পর বাহিরে ত গেলই না বরং আমারই হাতটা চেপে ধর্‌ল মুঠোর মধ্যে প্রাণ-পণে।......"

আমি বল্‌লাম—"একান্ত আত্মসমর্পনে।" ভবেশ বল্‌লে, "বোধ হয় ঘাব্‌ড়ে গিয়েই অম্‌নি করেছিল; যা-ই হোক, ভয়ের কিছু ঘট্‌লনা, দোরটা আপনিই বন্ধ হওয়ার শব্দ এল এবং কিছুপরে লীলাও উঠে বসল।"

তুমি প্রশ্ন কর্‌বে—আর কিছু হ'ল না? কিন্তু তার উত্তর এই-ই দিই। আর কিছু হওয়ার পথে ভবেশের ভীতি, কুণ্ঠাই ছিল রীতিমত আগ্‌লে; পরের কথায় এটা পরিষ্কার হবে।

"তারপরে দ্বিতীয় দিন রাত্রেও অমনি এসে পড়েছিলুম ওরই মাস দুই পর; যে একটু কাজ ছিল তা' শেষ করে' একটা ঘরে চুপচাপ দেহটা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট খাচ্ছি আর যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি, এমনি সময়ে শিকল উঠিয়ে দিয়ে কট্ করে' কুলুপ বন্ধের শব্দ হ'ল এবং বুঝলুম আমি আজ বন্দী হলুম। কি আর করব' নানারকম ভাব্‌চি এমনি অবস্থায়; রাত বোধ করি বারোটাই হবে, লীলা এক থালায় আমার জন্য খানকয়েক রুটী, কিছু তরকারী, ডাল ইত্যাদি হাতে দোরটী খুলে ঘরে ঢুক্‌ল এবং বন্ধ করে দিল; লীলার স্বামী রাত্রিতেই কাজে বেরুত; এ খাবার সে কোথায় পেল এ প্রশ্নের পর বেশীক্ষণ সে সত্য গোপন করে' উঠ্‌তে পার্‌ল

না, বোঝা গেল, সে তার খাবারই এনেচে আমার জন্য—কারুর ভালবাসার লোকের খাবার তৈরী করা বাংলাদেশের গেরস্ত-বাড়ীতে হওয়ার অবকাশ নাই—এটা জানতুম! যাক্ আমি খেলুম, সে-ও আমার পাতে প্রসাদ পেল। রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়লুম আবার আস্‌বার দিব্যি করে। নির্দ্দিষ্ট দিনটাতে মনে হ'ল সে কথা; কিন্তু কয়েকটা বন্ধু, গল্প, সিগারেট ইত্যাদির হৈ-চৈ নিয়েই কেটে গেল যাওয়া ঘট্‌ল না। ফের মাস দুই পরে গেছি; ঐ অনুযোগ—অভিমান সব আর কি! মন্দ চল্‌লনা দিনকতক, রাত্রে যেতাম, সুন্দর দৈহিক একটা পরিতোষের পর লীলা ঘুমিয়ে যেত আর আমি রাত জাগতুম—তার একটুও ভয় ছিলনা, মাঝে মাঝে সে-ও জাগ্‌তে না চাইত তা নয় কিন্তু ঘুমিয়ে পড়্‌তে তার মুহূর্ত্তও দেরী হ'ত না।

আমি প্রশ্ন করলুম "এখন?"

"সে অনেক দিন গেছে, ছিঁড়েও নয়, কিছুই নয়; অমনি শিথিল হয়ে গেছে; আর এখানে নাই-ওতো লীলা। তা'ছাড়া আমিও যাইনা, কিন্তু লীলা মেয়েটী সত্যিই সুশ্রী। ওর সম্পূর্ণ দেহেরই একটা চমৎকার মিল ছিল সব অঙ্গ ঘিরে। ভারী সুন্দর লাগ্‌ত। সাধ করে এটী ভোগ করতুম..............আর বেশ পাকা 'ককেট্' ছিল কিনা, প্রত্যেক ছেলেমিই তার কত চমৎকারই লাগ্‌ত, ওরকম ছেলেমানুষি না হলে' কি আর যা-তা কিছুর সঙ্গে সময় কাটান যেত, অথচ স্বার্থত্যাগ সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণ ছিল লীলাতে খুব—পরের সেবা করে' ও ভারী আহ্লাদই

পেত'—সবাই ওর সঙ্গে মিশ্‌লে ভালই বোধ কর্‌ত, হাসিখুসী লঘুচলা-ফেরা সহজ ভাবের সঙ্গে ঐ রকমের স্বাস্থ্য রূপ মিশ্‌লে যা হয় আর কি ......

"তা এ প্রণয়ীর অভিনয় ভাল লাগে না কেন তোমার ?"

".........আরে দুর্‌, আমি তার প্রণয়ী কি—প্রণয়ী তার সত্যি ছিল, যে সত্যিই ওকে ভালবাস্‌ত......" "সে আবার কি ?"

"......হ্যাঁ ওর একজন প্রণয়ী ছিল, সে সত্যিই যোগ্য, দেহে, রূপে, মনে, সব দিক্‌ দিয়েই সে লোকটী আমার চেয়ে অনেক উঁচু এবং লীলাও তাকে সত্যিই ভালবাস্‌ত—শুধু দেখ্‌বার খাতিরে ওরা অনেক রকমের বিপদকেই বরণ করেচে এবং লীলাও সত্যিই লোকটীকে ভালবাস্‌ত এবং পরম তৃপ্তি বোধ করত ; মার পর্য্যন্ত খেত তার হাতে তবু টান্‌ ছিল, সেটা একটুও শিথিল হ'ত না। আমি এসব লীলার মুখেই শুনেচি ; বিশেষ কিছু না ওকে ভজিয়ে বুঝিয়ে দিলাম আমার কারুর উপর হিংসে-ফিংসে হয় না, কারণ আমি জানি মানুষের মনে কি চায়, কি হয়। এবং এর পরে সে তার প্রণয়ীর বিবরণী দিতে সুরু কর্‌ল ইনিয়ে-বিনিয়ে ; তার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে' উঠ্‌ত, সে উজ্জ্বলতা আমি চমৎকার উপভোগ কর্‌তাম......"

আর ভেতরে ?

"আহা—সে একটা হিংসাত হবারই কথা...হচ্ছিলও, কিন্তু সত্যিই ওর ঐ উল্লাসের রূপ আমার ভুল হবে না, আজ এই বর্ষার দিনে একটু মনেও হচ্ছে সেই কথা......"

এইবার ভবেশ কবিতা আবৃত্তি সুরু কর্‌লে বেশ রাবীন্দ্রিক কায়দায় টেনে বিনিয়ে সুর আর ভাবের মিশাল্ দিয়ে দিয়ে।

এদিকে আমি চুপ করে আছি দেখে ভবেশ প্রশ্ন কর্‌ল, "আপনার ভাল লাগচে না? তা' লাগবেইনাত, কোন পুরুষই অন্য কোন পুরুষের প্রেমের গল্প পছন্দ করে না......" আমি বল্‌লুম, "না, আমি তোমার কথা শুনচি বেশ মন দিয়েই, এইবার তোমায় প্রশ্ন কর্‌ব। আচ্ছা লীলার প্রণয়ী থাকতে সে তোমায় চেয়েছিল তখন?"

"চেয়েছিল কেমন অনেক কষ্টই ওর প্রণয়ীর হাতে পেয়েও আমায় সে নির্ব্বাচন করে' রেখেছিল।"

"এটাতে কি এই-ই আসে না যে ও তোমাকে আরও গভীর করেই ভালবাস্‌ত, তুমিই যখন বল্‌চ লীলা সুখ এবং পরিতোষ পেত অনেক বেশী তোমার চেয়ে ওর প্রণয়ীর কাছে—!"

"সেত বটেই আমার চেয়ে যোগ্যতা তার সত্যি-ই বেশী যে, কিন্তু আমার প্রতি ওর আকর্ষণের হেতুটা আছে বলেই সেটার গভীরতা হবার কি হেতু আছে! ওটাও ছিল এটাও ছিল।"

"কিন্তু বিরোধের দিনে সে তোমায় বেছে নিয়েচে কেন?"

"ভেবেছিল হয়ত আমার দিক দিয়ে অন্য কোন সুবিধার কথা। আমি ও সব বড়-টড় কিছু দেখ্‌তে চাই না; সত্যি কথা যা তা ঐ একটুখানি মেশামিশির একটুখানি সুখ। বেশী গভীর করে' ধ'রে নিলে ওর-ও ভাল লাগ্‌ত না, আমারত নয়-ই। কিছুদিনে পুরণো সব-ই হয়। তখন সম্পর্শ চুম্বনের কিনারেও মন যায় না

সটান ঝাঁপিয়ে পড়ে—আপনাদের মার্জ্জিত ভাষায়······যাকে বলেন আসঙ্গ, তাতে।

তারপর সেটারও মোড় ঘোরে। এ-ত হবেই—। যা-ই হোক্ রাত হ'ল এবার আপনিও যান্ আমিও যাই—।"

ভবেশ তার বাসার পথে চল্‌ল, মেছুয়া বাজারের বাঁক ঘুরে, আমি কর্ণওয়ালিশ দিয়েই চল্‌লুম। রাস্তা নির্জ্জন হয়ে' এসেচে পথের ধারে একটা কুকুর ক্রমাগত ছুট্‌তে ছুট্‌তে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, আর ক্ষেপে আস্‌চে কেঁউ কেঁউ কর্‌তে কর্‌তে, কাউকে কাম্‌ড়াতে পারে তাই এদের নাকি সেঁকো বিষ খাইয়ে দিয়ে গেছেন—কর্ত্তৃপক্ষ, সহরের পক্ষে নিরাপদ নয় এই কারণে। একটা ইতিমধ্যেই অবিশ্যি রাস্তার ধারে পড়ে' গেছে, মৃত্যুর আগাম আয়োজন করে' নিয়ে। মনটা যেন কেমন হয়ে' গেল এই নিরীহ জীবের নিরীহ উত্তেজনা দেখে—

আর দেরী করলুম না, ছুটলুম প্রায়, জোরে পা চালিয়ে।

য়দ্বিতী ঘটনাটা খুব সংক্ষেপে বলে' শেষ কর্‌ব, সময় নাই। ভবেশ এখন আর সে ভবেশ নয় সে সক্রিয় হয়ে' উঠেচে, ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে। একটা মেয়েকে দেখে প্রথম হাল্‌কা ব্যাখ্যায় সে উড়িয়ে দিতেই এগিয়েছিল কিন্তু আর পার্‌লে না, অন্যত্র বিবাহের প্রস্তাবও সে সইতে পার্‌চে না। পাবে কি পাবে না এ নিয়ে তার দ্বন্দ্ব কাল্পনিক না হতে পারে কিন্তু তার মেতে-উঠা কাল্পনিক সীমারও পরিধি ছাড়াচ্ছে প্রায়। সে তার প্রণয়িনীর নাম করে'

মনে মনে শিউরে উঠে, আর এমন সব সুখের বা দুঃখের সোর-গোল তোলে আপন মনে যা প্রণয়িজন ব্যতীত সুলভ নয়।

ভবেশ জীবনকে ভুয়ো বলেই ঘোষণা করে কিন্তু আজকার ওর যে অনুভব তার ভিতরে ঐ ঘোষণার যেন ব্যত্যয় ঘট্‌চে। ভালো করে' পাওয়া এবং সুস্থ হয়ে' চাওয়া এর নাগাল না পেলে এমন হয় না। আরও মজা দেখ্‌চি—ওর আজ ধারণা, ওকেও মেয়েটী চায়—এ ধারণার পশ্চাতের সত্য কি তা বড় নয়, কিন্তু ধারণাটার ইতিহাস পড়্‌তে হলে বুঝ্‌তে পারা যায় ভুয়োমির দোহাইটা আজ ওকেই ধরে' রাখ্‌তে পারচে না।

জীবনের ভিতরে প্রেমের এ এককে নিয়ে আবির্ভাব। এ-আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, হোক্ তুচ্ছ পৃথিবীর সব, হোক অর্থহীন প্রবৃত্তির পোষা চতুরালি, তবু এ আস্‌বেই। প্রাণ দিয়ে চাইতে গেলে প্রাণ খুঁজবেই পরম এপ্রাপ্তিকে—অশিষ্ট সংঘর্ষের ভিতরে এই সোনার কুটীর সবার ভাগ্যে ঘটে না তবু একে খুঁজচে সবাই।

ভবেশের চরিত্র থেকেও তা প্রমাণ হয় না কি! ভবেশ অকপট, উদার, প্রাণের দিক দিয়ে পবিত্র সুস্থ—ওর ভিতরে এর ভাসা প্রতিভাত না হয়ে' পারেইনা যে।

আচ্ছা; এবার চিঠি পেতে তোমার একটু দেরী হবে। ইতি—

তোমার মন।

রচনাকাল

কলিকাতা ১৯৩৫

হোটেল সিসিল্।

ডিসেম্বর—৯, ১৯৩৮

মন্ আমি,

.........দিগন্তর চেহারা মনে কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিলাম। তোমার বর্ণনায় ঠিক ধরে' উঠ্‌তে পারচিনাকো। কি যে লেখো! কেমন করে' তাকায়? আমার মত? তাই নাকি! তোমার ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে সশব্দে হেসে ওঠে! আমার ইচ্ছে হয় ও বড় হলে' আমাকে ওর বোকা বলে' মনে হবে। দেখেচ, প্রত্যেক বোকা পিতার মতই আমার ভাবনা। মানুষ কি বোকা!

.... কল্‌কাতার কিছু দূরেই একটা হুদ্দায় আমাদের ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কিছুতেই দাঁত বস্‌ছিল না। আমি গিয়ে সেটা ঘটালুম, বোকামির এক অতি-পূজনীয় ঢং দেখিয়ে। একটা দামী ইউরোপীয়ানের বাড়ী গিয়ে উঠে সটান চেয়ারে বস্‌লুম চেপে, হাতে স্টেট্‌স্‌ম্যান্ মুখে হাসির ছোট-রেখা, একেবারে চালু ইংরেজী উচ্চারণে আর অতি-ছেঁদো আধুনিক ফ্লীট্‌ষ্ট্রীটের ঢালা ইংরাজীতে যে কটা কথায় তাঁকে দশ মিনিটে খুসী কর্‌লুম—তার ভাবার্থ, হঠাৎ তাঁর মত ভদ্রলোকের অস্তিত্বের খবর পেয়ে দেখা কর্‌তে এসেচি; তাঁর অর্থ-নৈতিক জ্ঞান সম্পর্কে আমার ধারণা বহুপূর্ব্বের, শ্রদ্ধার হেতুটাও তাই; এবং মার্কস লোকটা যে অর্থ-নৈতিক

যুগের পাগলা গারদ সৃষ্টি করেচে সেটার চিকিৎসা কর্তে ফ্রয়েডের চিকিৎসা কর্তে পারে এমন ধন্বন্তরি চাই—লোকটি চুপ করে' খুসীতে মজ্ছিল কিন্তু মনে হচ্ছিল, খরগোসের মত ওর কান নড়চে; সিগারেট চা অনেক কিছু বিতরণী হাজির কর্লে, আমিও নিভাঁজ-ইংরেজী কায়দায় সে গুলো উপেক্ষা কর্লুম এবং আমার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, বল্লুম—কথাটা মিথ্যে, ইচ্ছে ছিল এর ঘাড় মট্‌কে দিলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্টেটের মটকান কঠিন হবেনা। আর মিনিট দশ তারপর ১০০০০ টাকার বীমা ওর গলায় ঝুলিয়ে কর-মথন ইত্যাদি সাঙ্গ করে উঠ্লুম এবং ম্যাজিষ্ট্রেট আন্‌কোরা তরুণ ইংরেজ, পুরোণো ইংরেজটির ন্যাওটা—২০০০০ টাকা তার মাথায় চাপাতে খুব কমই দেরী হ'ল। ফির্লুম এবং দালালদের বল্লুম—এবার যাও বাকি বাঙ্গালীগুলো গড়ে সেরে এসো—এ হুদ্দায় আর আর কারুর হুদ্দাগিরি চল্‌বে না।······

আগের কথায় ফিরে ভাবতো, মানুষ কি বোকা? কি বোকা!

·········হোটেলে ফিরে দেখি একটা লোক মরে' গেছে, হঠাৎ। ভাবতে গেলে, আত্মহত্যা মনে হয়, কিন্তু আত্মহত্যা নয়; সকলের সঙ্গে সঙ্গে আমিও চল্লুম। বৈরাগ্যে নয়, বিরাগ আস্‌বার মত হাড় আমার এখনো হয়নি। শোক নয়, কারণ লোকটার সঙ্গে অগাধ মিশিচি, অন্তরের কথা কয়েচি কিন্তু অন্তরঙ্গতা তার ভিতরে একটুও ছিল না। ভয় আমার নাই, মৃত্যুর বিট্‌কেল আকার দেখলেই আমি মরবো বা আমার কেউ মরবে এমন আমি ভাবি না।

শ্মশানে মুদ্দফরাসদের আহ্লাদ, পুরুতের মন্ত্র এবং মন্ত্রশক্তি, ভিক্ষুনী ঠাকরুণদের হাত বাড়ানোর রেওয়াজ দেখে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মাড়োয়ারীর টুপি আর মোটারের মাতালে বাঁকঘোরা মনে উঠ্‌ল— কি বিশ্রী!

ডিসেম্বর মাস, কন্‌ কনে শীত ধোয়ানো ইত্যাদি খুব কায়দা করে' ফ্রেঞ্চ ধরণে সারা হ'ল। লোকটার আত্মীয় ছিলো একরাশ; কিন্তু ঐ-দিনে ওর কাছে কেউ ছিল না। চিতেয় উঠিয়ে দিলে ঠিক ছবির মত লোকটার চরিত্র আমার সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল……।

মহাদেব বসুর প্যাঁচ মার্‌লে, পুচ্ছ দিয়ে ও পুঞ্জ পুঞ্জ রমণীয়তা এক এক তোড়ে জমিয়ে আন্‌তে পার্‌ত। ভবেশের বস্তু-কাঙালে ঝাল ছুঁড়্‌লে ও সব পৃথিবীটা ঝালাপালা করে তুল্‌তো। বুঝচি না; মরে' গেছে বলেই কি আজ বড়ই বাড়িয়ে তুল্‌চি—ঐ ওর সাদা চাদরটা এখনো পড়ে আছে, মাথার প্রচুর চুল আর পায়ের শুষ্ক আঙুল এখনো দেখা যাচ্ছে—। আমার দুঃখ হচ্ছে বলে' বুঝ্‌চিনা (চিঠি লিখ্‌চি শ্মশান থেকে এসেই)।

…………কিন্তু এমন তাজা নির্ম্মল জীবন ছিল ওর! অথচ, তথ্য আর স্বপ্ন নিয়ে কেবল ও নিজেকে ফাঁকি দিয়েচে। এমন ফাঁকি আর কারুকে দিলে ওকে বল্‌তাম আমরা দস্যু! মেয়েদের সঙ্গে ও মিশ্‌তোনা; মজবে ভয়ে নয় মজাবে সন্দেহে— এ মজাতে ও চাইত না পৃথিবীর কাউকেও। একনিষ্ঠ প্রেমের এমন পাগলামি আর দেখিনি। নীরস কথার আর উত্তেজনা-হীন অঙ্গভঙ্গীর ও ছিল যেন প্রতীক। অথচ এই ঈজিপ্‌সিয়ান

মামির ভিতরে ছিলো অফুরন্ত প্রাণ। মাঝে মাঝে উপুড় হয়ে শুয়ে থাক্‌তো, বুঝ্‌তুম, ঐটে ওর আবেগের মুহূর্ত্ত। একদিন তেমনি সময় ঘরে ঢুক্‌তেই, ঝুপ্‌ করে' উঠে বল্‌লে—"বসুন"। কিন্তু চোখে মুখে এত পর্দ্দার পর পর্দ্দা প্রাণের তরঙ্গ যে আমার কাছে তা চাপা পড়ল না—ও তখনি চায়ের ফরমাস দিল। চলা-ফেরা ওর এমন রীতি-দুরস্ত যে কি বা কাকে ও ঘৃণা করে বা কি বা কাকে ও পছন্দ করে এ আমি বুঝিনি। মনে হ'ত ও কিছু মানতনা ; কিছু ওকে বাঁধেনি এক ওর সেই প্রেম ছাড়া।

টুক্‌রো কাগজে ছিঁটে ফোঁটা লেখা ওর বাই ছিল। —একদিন একটা পেয়েছিলাম, লেখা ছিল,

······ঘড়ির দম্‌ দেয় মানুষ! মানুষের দম্‌ দেবে কে? নারী! কোন্‌ নারী! কেমন করে' এ দম দিতে হয়! কি করে জান্‌বে?······

এত কাছে পেয়েছিল ও ওর প্রিয়াকে যে জয় করতে এগুতে ওর পৌরুষের মাথা নুয়ে পড়ত। স্থির হয়ে ভাব্‌ত আর নিজেকে অটোম্যাটিক পাম্পে স্ট্র্যাং-আপ করে' নিয়ে স্বপন দেখতো—। টাকা রোজগার কর্‌তো দিনে রাতে, অথচ কাউকে কিছু দিল্‌দরিয়া ভাবে দেওয়া ছিলো ওর একেবারেই কোষ্টীবিরুদ্ধ—। ক্রমাগত পাশ বুকে টাকা জমাত। কিন্তু স্বভাবটা ছিল ফাষ্ট-ক্লাস জেণ্টল্‌ম্যানের, একজন ভদ্রলোকে একজন ভদ্রলোকের কাছে যা আশা কর্‌তে পারে বা আদায় কর্‌তে পারে তা দিতে ওর কার্পণ্য ছিল না।

দু'টো কথা ও অনবরত বলত—একটা 'অ্যাস্‌সেটিজ্‌ম্' আর একটা 'সোসাইটি'—দু'টোই ওর শেখা বুলি বলে' মনে হ'ত। মৃত্যুর মাস দুই আগে এ দু'টো বুলি আর শুনিনি। এই সময়টা ও 'নটোরিয়াস্' হওয়ার কি দোষ এ সম্পর্কে খুব বল্‌ত—সেটাও যেন শেখানো। কিন্তু কারোর শেখানো বুলি কপ্‌চানো ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিলো—এই তিনটে কথা সুন্দর চিন্‌তে পেরেছিলুম। হয়ত বুলিগুলো ও ওর প্রিয়ার মারফতেই পেয়েছিল।

……কেন এটা ভাব্‌ছি জানো? আমিও দেখি কিনা, অবিকল তোমার বুলি সব আওড়চ্চি। হাস্‌চ নাকি? হাসো! তোমরা একদিনতো ছিলেই মাথার ওপরে—মা-প্রাধান্যের (বা ম্যাট্রিআর্কাল ইনটারপ্রিটেসন্ অব সোসাইটি) যুগ যে ছিল তাতো প্রমাণ হয়েই গেছে। তোমরা আবার প্রধান হওনা—! পিরেগুলো বোঝাতে আমি যেমন তোমার চুল টেনে দিতুম তেম্‌নি ষ্ট্রিগুবার্গ পড়াতে তুমি আমার নাক টেনে দাওনা—ভালোই লাগ্‌বে……ইস্ হাওয়াটা এত কনকনে কেন? লেপেও শীত যাচ্ছেনা—যেন……

কিন্তু এ লোকটির সম্পর্কে কি আস্‌চে তোমার? দরদ? দুঃখ? রাগ?……অনুরাগ নয়তো? আহা চটো কেন? তামাসা বোঝ না? ভয় কি? আমি বুড়ো হয়ে' কেমন করে' তোমায় আদর করে' মন ভোলাব এখন থেকে ভাব্‌চি। আর তুমি কেমন করে' জড়িয়ে ধর্‌বে ক্ষীণ বাহুলতা ঘিরে? শঙ্কাটা বোধ হয় আর একটু বাড়্‌বে, না? ছেলে-পুলে বড় হবে, দিগন্ত ধারালো

তাকাবে—তখন আমরা কি কর্ব বলোতো! যাক্গে, তীর্থ কর্বার নাম করে' দুজনে শিলং যাব সেই সবুজ সাড়িটা (হারিয়ে ফেলনিতো?) বিছিয়ে দেব। আমি বীণায় তান দেব আর তুমি গান······

হ্যাঁ, ওর নাম তারানন্দ, কি অকবি ধরণের·? ওর বাপ ছিল ঐ আনন্দী-মার্কা কিছু বা কাছাকাছি তা শুনিচিও। তারা নন্দের ছাই আজ পৃথিবীর মাটিতে বেশ মিশ্ খেয়ে গেছে। এখন ওর জিনিষগুলো আমি কি কর্ব? সবাই ধরে' নিয়েচে আমিই ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু? করি কি? ওর বুড়ো মা-টাকেও তার কর্লুম না যে।······একবার সব খুলে দেখ্ব? না; আগাগোড়া প্যাক্ করে' বাড়ী পাঠাব? ওর প্রিয়ার চোখেও পড়তে পারেতো! পারা উচিৎ না?

মরার পর ওর আঙুলের মধ্যে একটা রুমাল ছিল, অতি শাদা-সিধে—সেটাও পাঠিয়ে দেব। নিশ্চয়······

কিন্তু এত শীত কেন? জ্বরই আস্চে। উঃ অসহ্য বুকের ব্যথা কেন'······শুই······কাল তার কর্ব কেমন থাকি······ আজ এটা মেইলড্ হবে— ······

ইতি—তোমার মন্।·····

পাদটীকা—পাঠকবর্গের কাছে একটু নিবেদন আছে। মৃন্ময় বাবু অবিবাহিত লোক। তাঁর স্ত্রী-ই বা কোথা হতে এলো; এবং ছেলেই বা তার কোন্ ভূ-ভারতে চন্দ্র-কলার মত বাড়্ছে—এনিয়ে আমরা তাঁর সহকর্ম্মীরা প্রচুর গবেষণা কর্লুম। চিঠিগুলো এমন

ভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়্‌বে এ আমরাও ভাবিনি। যদি সত্যি-ই কোন স্ত্রী বা স্ত্রী-সদৃশ কেউ তার থাকে, এগুলো তাঁর চোখে পড়্‌বে। নইলে খামোকা এমন কেউ লিখে বাক্স বন্দী করে' রাখে এ-আমরা বুঝ্‌তেই পারি না। যে তিন্‌টে চরিত্রের বর্ণনা হয়েচে তা বরং একটু একটু চিনি—কিন্তু মন-আমিটি কোথায়? তাঁর বয়েস কত? রং কেমন? পাঠকদের ভাব্‌তে বলি না। পাঠিকারা বরং······যদি কেউ······কিন্তু আশ্চার্য্য, মৃন্ময় বাবু এমন সদালাপী প্রফুল্ল স্বভাব অথচ তলে তলে এত? ইতি—বন্ধুগণ।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ শাসমল।
শ্রীগুরুদাস মজুমদার।
শ্রীপ্রতাপ বল্লভ ঢোল।

পুনশ্চ। এসব ছাপ্‌বার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের। মৃন্ময় বাবুকে এ নিয়ে যেন কোনো সমালোচনা না হয় এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

রচনাকাল
কলিকাতা, ১৯৩৭।

এক ঘণ্টা

"এরে বাব্বারে বাবা, কি কুয়াসা……এই যে……ও……"

"এসো। আমার হ'য়েচে, কেবল চুলগুলো একটু……"

"বাপ্‌স্। যে-দুর্ঘটনা থেকে আজ পাগলাকে……আর একটু হ'লেই……এক্কাগাড়ীর কোচম্যান ব্যাটা……"

"থাক্। বোসো।"

"ধরো, ধরো মিমিকে ধরো……এই, এই গেল, যাঃ……"

"দেখ্‌লে? কী দুষ্টু! এতক্ষণ সমানে গ্রীক বলে' গেছে, আর 'ম্যা,' 'ম্যা' বলে' আমায় আদর ক'রেচে, আমি যেন ওর বিড়ালী মা! কি, অমন তাকাচ্চ!"

"আরও ঘুর্‌তুম, কিন্তু একদম ভালো লাগ্‌লনা, একা একা……"

"বেশতো; সোফারকে ডাকাও না, আবার বেরনো যাক্।"

"না। আজ তুমি ভালো নাই, চা-টা ওখানে তেম্‌নি পড়ে' ……খাবার……না আজ থাক্।"

"ঠিক ব'লেচ। আচ্ছা বলোনা আমায় তুমি আর কোনো দিন এমন দেখেচ? কোন্নোও দিন?……আঙুল খাচ্চিস্? দুর! না, যাদু, মাণিক, বাট্!……বলোনা, কোন্নোও দিন?"

"না। ওকে আমার কাছে দাও, ঘুমুবে। রিণ, আমি এখন যাই, তোমার এখন একা থাকাই ঠিক হবে।"

"ধ্যেৎ, কি বলো যে।······রাগ করোনা, মাথা খাও; আজ আমার······আজ আমার······" রিণুর হাসি চিক্-মিক্ করিয়া উঠিল। একটু পরে সে আবার সুরু করিল।

"ভাখোনা, কেমন সেজেচি। ঠিক্ এম্‌নি সাদা ব্লাউজ ..... মুখে একটু লাল......এই লাল পেড়ে সাড়ি এই খোঁপা ..... তোমার বিশ্রী লাগ্‌চে—জানি।......লক্ষীয়া মায়ি, তুমি যাওনা এখন......আচ্ছা সে কথা শুন্‌বে? রাগ কর্‌তে পার্‌বেনা কিন্তু; তুমি একটু সরো, এইটেতেই বোস্‌বো। এইবার বলি?"

"বলো।"

পরেশ আরাম-কেদারার হাতলটা একবার চাপিয়া ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিল। টুন্-টুন্ করিয়া ঘড়িতে মিহি সুরে ন'টা বাজিল। রিণু কপালের চুলগুলো আস্তে সরাইয়া লইল। সুরু করিল—"আমি যাঁর কথা বল্‌বো, তিনি একজন যুবক। পুরুষ।......"

"আত্মীয় কেউ-উ বোধ হয়?......"

"কিছু একটা আত্মীয়তা, তা ছিলো হয়তো, ভুলে গেছলুম। তুমি কথার মধ্যে কথা বল্‌বেনা। চুপ্ করে' শুন্‌বে লক্ষ্মীটির মতো! তাঁর নাকটা ছিল ভুটিয়াদের মতো, কপাল খাটো......কী যে আগুন, কঠিন, কিন্তু সঙ্কোচে ভরা, এইখানে একটা কাটা দাগ, যেন ছুরি দিয়ে কেটে কিছু লেখা......কেমন যে শ্রী ফুট্‌তো মুখে! যখন বল্‌তেন 'দৃঢ়-প্রত্যয়'; অঙ্গুলিক্ষেপণ ছিল আর এক বৈশিষ্ট! নুইয়ে নেবার সেটা যেন ম্যাজিক।

যখন বল্‌তেন প্রাণ ঢেলে বল্‌তেন, যখন চল্‌তেন মেতে চল্‌তেন। কীযে অসামঞ্জস্য তাঁর আগাগোড়া! খুসী হলে' তাকাতেন, যেন দয়া মাঙ্‌চেন্, অভিমান হ'লে উপোস করে' প্রতিশোধ নিতেন নিজের ওপর!......"

"দাঁড়াও। একে শুইয়ে নিই। এক পেয়ালা চা, লখীয়া মায়ি?"

"হিঁ বাবুজি!......"

"কী! কি বল্‌ছিলাম?"

"অসামঞ্জস্য......"

"বাঃ, তুমি বেশ গম্ভীর হয়ে শুন্‌চতো! প্রথম যেদিন দেখি, সে আমাদের পাশের বাড়িতে, ইনি কোথাকার কি এক দুর্ভিক্ষের চাঁদা আদায়ে এসেচেন—জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌লুম .....কৌতুহল? না। ও মুখে কৌতুহলের কিছু ছিল না......শুন্‌লুম অমির মেজদার বন্ধু, খুব ধনী, বাপের এক ছেলে। অমির সাম্‌নেই ......মাগো মা দেখে বড়লোক বলে' একটুও মনে হ'ল না। হ্যাঁ, হ্যাখো, কোনো সাজেই যেন ঠিক এঁকে সাজেনা, মনে হয় অন্য সাজ গোছে বুঝি ভাল মানাতো।......হঠাৎ একদিন দেখি লাইব্রেরী-আন্দোলনের সঙ্গে লেগে গেছেন—কাগজে নাম।......

......ফাঁকে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে' গেল পাঁচ-ছ দিন, অমির সঙ্গে আয়োজন করে'ছিলুম। কয়েকটা কথা জিগ্যেস কর্‌তে কি-যে ইচ্ছে হ'ত! যেদিন অবকাশ হ'ল সেদিন শুধু ঘাম্‌তেই পার্‌লুম, মুখ তুল্‌তেও পারিনি। উনি বলে' গেলেন, "কাজ

আছে।" যাবার সময় পাখাটা খুলে' দিয়ে গেলেন। হঠাৎ শুনি, অমির সঙ্গে এঁর বিয়ে, তেম্‌নিই আর একদিন শুনি, এঁর নয়, এঁর আর এক বন্ধুর, ইনি ঘটকালি কর্‌চেন।······

"এর পরের আলাপটুকু বেশ অবিচ্ছিন্ন ভাবেই ঘট্‌ল। আমি তখন ফাষ্ট ইয়ারে পড়ি, আর উনি সদাগরী আপিস্‌ নিয়ে আছেন। রুটি আর টাকায় কি হচ্চে কি হওয়াচ্চে এই গবেষণা নিয়েই তিনি তখন ব্যস্ত। সে-গবেষণা······এমন করে' যে সংসারকে কেউ বিদ্রূপ কর্‌তে পারে! সেই কেমন বড়-লোক বুড়ো-খোকার অভিনয় করে মেজাজ আর মর্‌জির চুষি-কাঠি নিয়ে; বাবু-লোক গাধার বোঝা টানে আর আনন্দ পায় ন্যাজে-গোবরে ন্যাকামি করে'; কুলি গুলো ঘেমে ঠকিয়ে, ধোঁয়া খেয়ে বারো আনা উপায় করে' তাড়ি খেয়ে দাঁত বার করে' হাসে, মুখে এসে বসে মাছি; চাষার দল সারা বছরের ধান-পাট রাজা-মহাজনকে দিয়ে মেলায় গিয়ে খায় পচা খাবার আর নেয় তার চেয়েও পচা সংগ্রহ, বাড়ি ফেরে চটি জুতো পরে' চড়ার পথ দিয়ে, কস্‌ গড়িয়ে পড়ে পানের রস, মাথা চুঁইয়ে পড়ে তেল······সেই কেমন করে' ······তুমি ঢুল্‌চ?······"

"না।"

"শোনো। সেদিন শুক্রবার, রমলাদির বোট্যানির ক্লাশ পালিয়ে চুপ করে' এসে বসেচি······"

"কারুর জন্য পথ চেয়ে?"

"হ্যাঁ, আর কাল গুণে"।

"এমন সময় তোমার উনি এলেন, না ?"

"হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত হয়ে'। একটা সাদা আধময়লা পাঞ্জাবী গায়ে। চেয়ার টেনে বস্‌লেন, একটু হাঁপালেন, একটু হাস্‌লেন, কপালের ঘাম মুছলেন—খুব হেঁটেছিলেন বোধ হয়। কাফি চাইলেন, বড্ড কাফি খেতেন, বল্‌তেন কাফি নয় 'লাইফ-এলিকসির্', ছোট একটা কৌটোয় ভর্‌তি থাক্‌ত···আমি ষ্টোভ জ্বেলে কাফির জল চড়ালুম্, উনি আরম্ভ কর্‌লেন, "ছাখো রিণু, কাল রাতে দেখি (তখন মাঘ) একটা লোক দেয়ালের বিজ্ঞাপনে লজ্জা নিবারণ করে' তাতেই গা-মাথা ঢেকে ঘুমুচ্চে," বল্‌লেন, 'কত বিশ্রী এই আমাদের সভ্যতা!' সমস্ত মানুষকে যে এমন করে' ভালোবাসা যায় ওঁকে দেখে বুঝ্‌লুম···এম্‌নি ভাব্‌চি বুঝেই যেন বল্‌লেন, 'ভালোবাসা, মানুষকে ? সেতো অনেকেই বেসেচে; মানুষের তাতে কি হ'ল ? পরের দুঃখ দেখে বুদ্ধ হওয়া ? তাতে কি হবে ? মানুষ পেট পুরে খাবে, পাখীর মত স্বাধীন আনন্দে ঘুরে বেড়াবে, কবে আস্‌বে, সে দিন কবে আস্‌বে ? আমি বুঝ্‌তে পারি না, শুধু ভাবি এ পিশাচ বৃত্তির হেতু কোথায় এ পৃথিবীতে ?' এঁর চোখের কোন্‌টা জ্বলে' উঠ্‌ল। অসাড়ে টেব্‌লের ওপর মাথা রাখ্‌লুম্, অন্তর-বাহিরে সেদিন যেন আমার কি!······ঝট্ পট্ উঠ্‌লেন, আবার ফিরে এলেন, বল্‌লেন, 'রিণু তোমায় ভালোবাসি' সে কথা শুনে না এলো আবেগ না হ'ল ভয়। অদ্ভুত সে বল্‌বার ভঙ্গী। যেন আর কারুর ভালোবাসা জ্ঞাপন কর্‌ছিলেন! না পাণিপ্রার্থনা, না তন্ময়তা, কিছুই না, একেবারে

কিছুই না! ঐ সঙ্গে বল্‌লেন, 'তুমি আমায় বিশ্বাস করো?' ইচ্ছে হচ্চিল হাজার কণ্ঠে বলি—করি, করি, করি।

কিন্তু কিছুই হ'লনা। উনিও তো উত্তরের অপেক্ষা কর্‌তে জান্‌তেন না। তাই বুঝি কী বিশ্বাস আমি ওঁকে করি, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে পশ্চাদনুসরণ কর্‌তে হলে'ও আমার দ্বিধা নাই প্রশ্ন নাই। এমন অস্থিরমতিকে কেন এত বিশ্বাস করি, জানিনা, কিন্তু······কেউ ঠক্‌বে না ওঁর কাছে।"

"আর আমায়?"

"না, না, ওসব······তোমায়······চিন্তাও যে পাপ। ছুর্। আবার সুরু কর্‌লেন, এ চিড়িয়াখানার কোথায় একটা গলদ, ধর্‌তে পার্‌লে, এম্‌নি ক'রে ভেঙে দিতুম, বুঝ্‌লে রিণু?' একটা অসম্ভব মোটা লাঠি থাক্‌তো, সেটা মেজেয় বার কয়েক ঠুকে' গট্-গট্ করে' বেরিয়ে গেলেন; আবার ফির্‌লেন, 'রিণু, তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌তে ইচ্ছে হয়, পার্‌লামনা, আমার হাত ওঠেনা, বল্‌চি, জয়ী হও ইচ্ছে হ'ল হাত দুটো······পার্‌লামনা; কেবল সন্ধ্যে হচ্চে, উনি মিলিয়ে গেলেন। ঠিক ছ'বছর। আর দেখা হয়নি ·····কি কর্‌চেন?······কোথায়?······পরণে সেদিন আমার এম্‌নি সাড়ি, জামা, স—ব!"

"রিণু?"

"অ্যাঁ।"

"তুমি এঁকে ভালোবাসো?"

"ভালো? বাসিনা। কি জানি, বাসি বোধ হয়···না!"

—টুন্-টুন্-টুন্……

"মাগো, দশটা বেজে গেল, ঐ ছাখো, মিমি হাঁ কর্‌চে, কাঁদ্‌বে বলে,' ওকে……

"রিণ এঁকেই তোমার বিয়ে করা উচিৎ ছিলো।"

"বা—বা, কি যে বলে। সমস্ত দেহে, মনে, আমি তোমার, তো—মার। এখন হ'ল! এতো কুয়াসা, এম্‌নি একটু খাপ-ছাড়া যদি হইই, ঈর্ষা করো না লক্ষ্মীটি! খাপে পুরে', নিশ্চিন্তে নিয়ে চলো বেড়াতে! হয়েচে, এইবার চান্ করো শীগ্‌গীর, আমি সারাটা দুপুর তোমার বেহালা শুন্‌বো……"

"কি এখনো মুখ ভার? রাগ গেল না!……"

রিণু হাসিল। প্রভাতী আলোর মত সহজ আর তীব্র। "ব্যাপারটা আগাগোড়া বানানো, কাল্‌কে একটা গল্প পড়েছিলাম তারই……কিন্তু বলোতো একটা ঘণ্টা কেমন লাগ্‌লো?"

"ভালো। গপ্প? তাই নাকি?……"

পরেশের মুখে সজীব আনন্দ।

রচনাকাল
কলিকাতা, ১৯২৯।

হরিপদর ডায়েরী

১১ই মার্চ্চ, ১৯৩০।

আমার বারোবছরের লেখা ডায়েরীর পাতা! ছিঁড়ে বাঁচলাম যেন। কি নেশায় পেয়েছিল?

কেমন করে' ছিঁড়লাম? পারচিনা। এ বারোবছর মনে করতেও গা ঘিন্-ঘিন্ কর্‌চে। যা-করেছি'র পিঠে আর কত হাত বুলোব? কিন্তু আবার লিখ্‌চি কেন? তা-ও ভাব্‌তে পার্‌চিনা। থাক। আর লিখ্‌লাম না।......

১২ই মার্চ্চ ১৯৩০।

কাল সন্ধ্যা আর আজ সন্ধ্যা। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা। নৌকা চল্‌চেই, বিরাম নাই আরও দূরে? এ নৌকার কি চলত্ব নাই। কোথায় বাংলা দেশের সেই ছত্রিশ-গড়? না, সাতশো-গড়? যদি মেদিনী-পুরীই বনে' যাই? মন্দ কি! আজকার সন্ধ্যার যেন সন্ধ্যাত্ব নাই। চাঁদের আলো, বালুচর; আর হাটি-টি তাকে চাব্‌ড়ে জাগাচ্ছে। কিন্তু কালকার প্রশ্ন! লিখ্‌চি কেন? হৃদয় ফিক্ করে' হেসে বল্‌চে—সে দেখ্‌বে, তাই। হা-রে অদৃষ্ট! কোথায় আমার এ লেখা, আর কোথায় সে? তার প্রথম উন্মেষের লাবণ্য-হিল্লোল! তার প্রথম পরিপূর্ণতা! আমার দুর্ব্বলতায় আমি তাকে বাঁধ্‌ব! আমি হব তার চরিতার্থতা! সে তন্বী দেহে

লাগ্‌বে আমার প্রাণের ঢেউ! সে শিথিল চাঞ্চল্য হবে আমার সৌরভে উদাস? সে প্রজ্ঞা এসে ভিড়্‌বে আমার হৃদয়ের উপকূলে? হবে? একি হয়? কার যেন কে হারিয়ে গেছে! গাঙের কূলে দাঁড়িয়ে ডাকৃচে। আমিও কেন চেঁচিয়ে ডাকিনা! কাল পেয়েছিলাম না। আজ পেয়েচি। ·

সে আমায় নেবে?—তার প্রতিভার ছোঁয়া দিয়ে সে যদি আমায় জাগ্রত না করে, তবে আমায় ঘুমিয়ে দিক্—পুঞ্জীভূত, আলুলায়িত নমনীয়তার সাগরে! পারি না! অবসন্ন! পারি না।······

২২শে জুন ১৯৩১।

প্রত্নতত্ত্ব ভালো লাগে না। এ হিন্দুর আঁকা বৌদ্ধমূর্ত্তি, না বৌদ্ধের আঁকা হিন্দুমূর্ত্তি? বাঁকা অক্ষর কিসের লক্ষণ? সুডৌল কোণ কি সূচিত করে? কালীপূজা দ্রাবিড়ীয়? ভাল লাগচে না, যদি সত্যি ছাত্র হ'তাম তক্ষশীলার মিউজিয়ামে জীবন কাটাতাম! জ্ঞান-চর্চ্চা আছে কিন্তু জ্ঞানলিপ্সা আমার কোথায় গেল?······

১মে—১৯৩২।

অকপট হব! তারপর, যাহোক্, হোক। আমার আজ মুক্তি নাই। কাঙালের হাত আমার একখানা হাত টেনে ধরেচে! টেনে-হিঁচ্‌ড়ে ছিনিয়ে আস্‌তে পার্‌চি কৈ—? দয়া আমি জানি না। দান আমার অজ্ঞাত। তবু এ কিসের বন্ধন? দেহ দিয়ে বাঁধতে চায় সে! কি চায় সে? আমার নিষ্ক্রিয় অরুচি, আর

ক্লিষ্ট করুণা? আমাকে দিয়ে কি তৈরী কর্‌বে? নিছক ত্বকাচার, নিভাঁজ ড্রিল।

মর‍্যাল এলিমেণ্ট তাতে নেই। কিন্তু মনের গায়ে গায়ে এত অবসাদ যে! আহ্বান যে আক্রমণের মত। কোথায় পালাব? পৃথিবীর কোন্‌ প্রান্তে সারা-দিনের দেহ্‌ পুড়ে গেছে, রাত ক্ষতি-পূরণ নিচ্ছে। মেঘ-গর্জ্জন আর অঝোর বর্ষন! আমার দগ্ধ-অহং এর ক্ষতিপূরণ আজ হ্‌বে নাকি?......

৩রা মে ১৯৩২।

ক্ষতিপূরণ হ্‌'ল কি? একমুহূর্ত্তের কি নিবিড় সে পরিচয়! ধূলাধরা মন হ্‌'ল আমার ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ। অন্তস্তল অবধি উলঙ্গ পারিপাট্য এনে দিলে। যেন আমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এলো নেমে। কি পেয়েছি? কি পাইনি? জানিনা। আমি বুঝেছি আমি কোথায়।—কে আমায় বাঁশির মত বাজিয়ে তুল্‌তে পারে।...

৭ই জুন ১৯৩২।

সুরাটে বিশ্রী গরম। কবে আমি আদেশ পালন কর্‌তে পার্‌ব? ধ্যানে আমি যদি ডুবে যাই,—ডুবেই যাব। তার উপদেশ কি হবে? কিন্তু বিলীনমান সে মন দিয়ে কি আর কিছুই হবে? উৎফুল্ল মনোমুকুরে যদি এক এসে আসন নেয়, আর কিছু কি থাক্‌বে? তার চেয়ে তার ধ্যান, সে যে অনেক—অনেক বড়। হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল হয়ে আসে। ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে' আসে ইন্দ্রিয়ের সশব্দ পদক্ষেপ। এ, সাধনা।

এ সাধনায় যদি একদিন আমায় ভাসিয়ে নেয়! ভালোইত? তাই বলো। তাই যেন হয়।

১২ই জুন ১৯৩২

এক পশলা বৃষ্টি হ'ল। মনের আকাঙ্ক্ষা-শতদলে দল মেলেছিল। নিভ্‌ল। আকাশের বুক ভরে' অন্ধকারের অগাধ দারিদ্র্য। বুকের স্পন্দন সে দারিদ্র্যে লয় হয়ে' আস্‌চে। একটা খ্যাঁক্‌শিয়েল খেঁকিয়ে চলে' যাচ্ছে আর ঘুরে' আস্‌চে এক-ই রাস্তা ধরে' বারবার। আমার নিরব বাতিটা বলে' দিচ্চে আমি একা—একা। মানুষ খাদ্য নয়, তবু লক্ষ ডানা তুলে এমন করে চায় কেন প্রাণ? শেষ যৌবনের এ শেষ বসন্ত—হাঁড় ছেঁচে তার রস উঠ্‌চে, ফুল ফুট্‌চে। এ ফুল ঝর্‌বে—এ গান থাম্‌বে—মড়া ফুলের দেহ তখন পথিকে কাঁদায় চিপ্‌টে দিয়ে যাবে। বাঃ! আমার হাত-তালি দিতে সাধ হচ্চে। 'পুনীতা' যদি 'পুণ্য-বন্ধন' কে মেনে নেয়—বকরঈদের কোরবানী-পর্ব্ব শেষ হয়। আর উপায় নাই। কিছু নাই। পরের পর্ব্বে, নাটকীয় নৈরাশ্য—'গেছিগো-গেছি'। নৈরাশ্য ইষ্টিম্ দিয়ে চালাবে, আট্‌লান্টিকের ওপর দিয়ে শূন্যে শূন্যে। রথী একটু একটু কাঁদ্‌বে, টোষ্ট্ পুডিং খাবে আর চল্‌বে মজাদার। চাইকি, নতুন প্যাকিং বাক্সে টাটকা সুখ, রুজ্ মেখে এসে পড়তেও পারে—একেবারে 'মেইড্-ইন্-ইংল্যাণ্ড'। ঠিক, ঠিক, হাড্ডিসার কয়েদির পিঠে চাবুক চলা চাই। এ আপম-খোরের মত ঝিমুচে। চালাও চাবুক।

ঠিক সব হয়ে' আস্‌বে। ব্যবস্থা অর্থে এই। এই-ই। হিপ্-হিপ্ হুর্‌রে—।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪।

মাঠের ফসল একদফা উঠে গেছে। কাটা ধানের খোঁচ্-গুলো পড়ে' আছে। কাস্তের আঘাত, নাই তবু আছে। পাশ দিয়ে একটু একটু নরম কাদা—পিঙ্‌সে, পাণ্ডুর, কালো। দেখ্‌লে মনে হয়, যারা কাটুনি তারা শেষ করে কাটেনা; কেন? এর পরে মাঠে আগুণ দেবে যারা তারাই ধন্যবাদার্হ। জীবনটা শোক, স্বাস্থ্য এখানে মিথ্যাচার, সুখ এখানে বোকামির ঐতিহ্য-গ্রন্থি। ঐ শোনো। নীল বিবর্ণতা! জীবন-নদীর বুক থেকে উগ্‌লে উঠ্‌ছে তারই ধ্বনি—কাদা, ময়লা, ঘুর্ণী আর আতঙ্ক, তার প্রতি ছন্দে। চুপ্। শুয়ে পড়। হে রাত্রির শবদেহ! এবার দেহ রাখো।······

১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৫।

মাথায় আঘাত, স্ফীতি, ব্যথা। আজও আছে। থাক্। এরা শিশুর আনন্দে থেই-থেই নাচ্‌চে। বল্‌চে, ব্যথা দিতে পারে একজন। এ-ও যদি দিতে কার্পণ্য করে? কোন ব্যথাই যদি অনুভবে না পৌঁছয়? বেশ হয়। স্বর্গতো ঐ। মান্দালয় জায়গাটা এই স্বর্গের নেশা আন্‌চে। বর্ম্মীরা বৌদ্ধ। ঠিক। এরা কাঁদে, হাসে, পোষাক পরে, খায়, মরে সবই গা ঢেলে দিয়ে! আগ্রহ এদের এক গজ, সুখ, স্মৃতির দোর অবধি, শোক ফাঁকের পাদ পূরণ মাত্র। প্রেম পড়্‌তা বঝে'। আমার প্রকাণ্ড

খ্যাতি, পণ্ডিত্য, কৃতিত্বের শারদীয় শোভা আজ কোন্ অখ্যাত গোলাবাড়ীর দামী পক্কতা হয়ে' আছে? কিন্তু শীত এল! প্রতিভার মুখে বিবর্ণ ধোঁয়া, কম্প, অবসাদ!

১১ই মে, ১৯৩৬।

কাজের আগেও আকাঙ্ক্ষা নাই—পরেও তৃপ্তি নাই। তব এ মালগাড়ি ছুটেচে ঘটাং-ঘটাং কর্‌তে কর্‌তে। এই নিসাড় নি-বশ গাড়ির মালিক কোথায় গেছে? কোথায় ও দাঁড়াবে? জল-কয়লা ওর একবার আগাগোড়া বদ্‌লে নিলে হয় না?......

১২ই মে, ১৯৩৬।

আমায় শিশুর মত ভাব্‌বে? ভাবো। আমাকে ভাব্‌তে ত পার্‌বে না। আমার মত মনে হয় এমন—কিছুই ভাবো। 'আমি' ভাবনা হতে'ও চাইনি। হাস্‌লে! ভাব্‌লে এ আমার অভিমান। হয়তো তাই। আমার চাওয়া তোমার হিসাব বই আর অঙ্কে ধর্‌বে না, ধরেনা যে। যদি মঙ্গল চাও এ হিসাব খাতাটা বিলকুল না-পশন্দ্ করোত। ভাল হবে। ভাব্‌চ, এটা রাগ। তা নয়। এ আমার দূরদৃষ্টি। তোমার মনে হয়েচে, আমার ভিতরে হিউমার নাই। অর্থাৎ আমি শুকিয়ে গেছি। যদি সত্যিই শুকিয়ে যেতাম! যদি সত্যি-ই দেখ্‌তে, তোমার সম্মুখে জড় কাষ্ঠপিণ্ড মাত্র! আমি সুখী হতাম। প্রতিহিংসা! না-না। একটা মরা কাঠের ওপর বসে' বসে এ বিসদৃশ ভাবনা আমার। ক্ষমা করো। এক চাপড়ে ধপাস করে' পড়ে' গিয়ে

যাত্রাই ঢঙে মৃত্যুর রোমাঞ্চ আমার আদৌ নাই। একটা পিঁপ্ড়ের খানিকটা দেহ খুলে গেছে তবু সে চলেচে, যেন তার কোনো লোকসান হয়নি। ও বীর। আমার দুর্ব্বলতাও কি বীরত্ব নয়? ভেবে দেখোতো, এ-দুর্ব্বলতায় বীরত্বের আভাস পাও কিনা?...

১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৬।

মধু-শিথিলতা আমার মনমণ্ডলের রোমে রোমে। আকাশে এক ফালি ধোঁয়াটে মেঘ। ঘুর্‌চে। চেয়ে দেখ্‌বার বল নাই। কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত শুধু এক হিমাঙ্গ আলস! একি! শান্তি না শ্রান্তি? মরণ কি এম্‌নি? দেহ ধঁকিয়ে উঠেছে হাল্-ছাড়া কাজে! কিন্তু হাল-ছেঁড়া মনে লেগে আছে আরও কাজের কিল্‌বিলানি!

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৬।

পৃথিবী ঘুর্‌চে। শূণ্যের আবর্ত্ত-মালা তাতে ফেনিল হ'ল। জেড্ডাতে এসেও দেখ্‌চি এ আমার সেই-আমি। ঐ ফেণিলতার রঙ্ লেগেচে এতে। ঘুর্‌চি। দূরে ভারতের ভারতীয় ধরণের শীর্ণ কৃষ্ণকায় দুঃখ আর ভাবী বৈকুণ্ঠের স্বপ্ন। আমার কিসের স্বপ্ন? মায়া ভাঙ্‌চে কে আমার। বিবর্ণ অসাড়তা। কি হ'ল? পার্‌চি না! পারিনা! পারিনা।

রচনাকাল

চুকনগর, খুলনা, ১৯৩৭।

"বাঁহাতে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলাম"—১৩৩নং ট্যাক্সি—আস্তে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। হাজরা রোডের মোড়। 'চালাও—'। "কাঁহা যানে হোগা বাবু?" 'সিধা'। চুরুট ধরাইলাম। চলিতে পাইয়া বাঁচিলাম—। আমার গতি এখন খুব কম ঘণ্টায় কুড়ি মাইল! রাত্রি বারোটা—।

"ঐ সামনে পূর্ণ থিয়েটার। এইখানেই রেণু একদিন...... রাত্তিরে মোটরের শিঙ্গার শব্দ কী ভারী! ওটা—ও, ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী—এখন বুঝি বন্ধ! এত রাতেও ভিক্ষের জন্য অন্ধ হাতড়াইতেছে—পেটের কি সখ্! এম্প্রেস থিয়েটারে কি চলিতেছে বা। সরলা। এত লোক। কী, নেপাল কিউরিও, যাক্‌গে—পেটগুলা যেন টাকা গিলিতে ফাঁদ পাতিয়াছে—বা—! দোকান মনে করা এদের ভুল, একেবারেই ভুল! চৌরঙ্গী! সেই বিজ্ঞাপন, ট্রাম, মোটর, সেই রূপসীদের পোষাক, ইতস্তত গমন—আগমন। সেই, সব সেই। কেমন যেন বোধ হইতেছে। দুঃখ? বেদনা?—না, না!......ড্রাইভারটা আর একবার তাকাইল—সে আমাকে কোন্ শ্রেণী-বিশেষের মনে করিতেছে তা আমি জানি। আমি আবার সঙ্কেত করিলাম। ওয়েলিংটন পার্ক, বিধান রায়ের বাড়ী—ভীম নাগ—কলেজ হাঁসপাতাল—। ট্যাক্সি লাফাইয়া উঠিল। একটা লোক আর একটু হইলেই—'গঙ্গার ঘাট'। আবার ট্যাক্সি ঘুরিল। বউবাজার। চিৎপুর।

ড্রাইভার একটা রাসমণি মোদক নাকি—দোকানের পাশে থামিল ১৩২ নং—।

"'হীঁয়া মৎ'।—'বাবু একঠো বহুৎ খাপস্নুরৎ—।' আমি হাসিলাম। 'ড্রিঙ্ক্‌ করেগা বাবু?' এবার বলিয়া উঠিলাম—'নেহি'। চাহিয়া দেখি তখনো সেই রাতে, দেহ-দোকানের লোভনীয় অংশটুকু অনাবৃত-প্রায় রাখিয়া এরা শীকার খুঁজিতেছে তিন জনে। রাস্তার উপরে আসা নিষেধ। কিন্তু আঁধার গলিটার ভিতরে থেকেই এদের ছ'খানা চোখ আছড়াইয়া পড়িতেছে—আমাকে যেন······এই রূপের খোসাগুলো কত যত্নে বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া······পৃথিবীটা······সব খোসা······কিন্তু দৃষ্টি ওদের বড় ম্লান······শীকারির মতন নয়—যেমন খদ্দের-না-জোটা দোকান-দারের হয় তেমনি। এদের প্যাঁচা-ঠাকরুণ্‌ বলিলেও হয়—। এরা রাত্রির ঝোপের বিষন্ন বীভৎসতা! আবার—আমার তাকানোতে ড্রাইভার ব্যাটা ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছে—'বহুৎ'······'—আস্নুন না বাবু, বস্‌বেন!' ছোটো একটু স্বর ঝিন্‌ করিয়া পড়িল।

'গঙ্গার ঘাট।' বেটা গাড়ী থেকে নামিয়া পড়িয়াছে। ঘুঁসি উঁচাইতেই তার মনোহরণতা বিগ্‌ড়াইয়া গেল—।

"আবার—না কিছু না। বাঁধারে ওটা মাঠ, ওখানে সাধুরা মেলা বসাইয়াছে—ডানধারে, ওটা বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট—ঐতো সেই ধোঁয়া রংএর বাড়ী। কতদিন পর! সরলার বিয়ে! এতদিন কি আর ও বাকি থাকে। অ্যাড্‌ভোকেটের মেয়ে। বি-এ

পাশ বোধহয় ওর ঘটেনি······কি আশ্চর্য্য! গানেই দিনগুলো যেন ফেনায়িত হইয়া, টগ্‌বগ্ করিয়া চলিয়া যাইত। তর্ক—? হ্যাঁ, তাতেও একটু মিষ্টি ছিল। বিকাল বেলা, সেদিনটা কী বার, কি-একটা যেন মস্ত মিছিল বাহির হইবার কথা ছিল। আমরা বসিয়া—। অনেক কথা—না ভুল হইল। অনেক ভঙ্গি। চোখের কোণে তরঙ্গ। গালে টোল্। মৃদু হাসি। ফুলের গন্ধ। হাওয়ায় কাপড়ের পত্-পত্ শির্-শির শব্দ—। আমার হাত লুকানো ছিল চাদরের মধ্যে। কনুই চাপিয়া ধরিয়াছিল। ঠোঁট্ কাঁপিতেছিল। চোখ্ টল্‌মলে। সন্ধ্যা হইয়াছে মাত্র—মিছিল ভয়ঙ্কর-কিছুর দেহায়তন লইয়া চলিতেছে। আমরা সেই পর্দ্দার ধারে। মানুষকে মানুষের আবার দরকার কি? দৃষ্টি আবেগ-আতুর। আমি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, '—চলো এবার যাই—।' প্রাণের ক্ষুধায় মানুষের এত দুঃখ?···

"ছোটবেলায় বিড়াল মরিলে, বুকে করিয়া আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলাম। কিশোরে দেশলায়ের কাঠি জ্বালিয়াও বন্ধুর মুখ দেখিয়া ছিলাম······। বড় ঠুন্‌কো। যৌবনে—? বোধহয় কলিকাতার প্রত্যেক গলিতেই—কাউকে কাউকে 'ভালো বাসিয়াছিলাম'। অনেক মোটর গাড়ী। অনেক স্থান। অনেক গন্ধ। অনেক জান্‌লা। অনেক—অনেক।······

"টাকা বরং তার চেয়ে একটু বেশীক্ষণ থাকে প্রাণের উড়ো ধোঁয়ার চেয়ে। হাজার টাকা আমার একমাস থাকে। বড় জোর দু-একশো বেশী। টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। বটুকে আমার

মা-ছাড়া কি বলিব ? যখন সে বলে—'আর দেরী করোনা বাবু'। কান্নুর মা কি পরিপাটী বিছনা করে, ঘর গুছোয়, সে আমার বোন্। হরে' আমার বৌ হতে পারে নাকি ? এস্রাজ শুনায়। অযথা গন্ধ মেঝেতে ঢালিয়া শেষ করে। মাথার চুলে সুড়্-সুড়ি দেয়, পা-টেপে। এর চেয়ে আর কি বেশী বৌ করে ?

"বলো হরি, হরি বোল্—।"

"বিশ্রি।" শোভাবাজার। "এই জলদি করো। গঙ্গার ঘাট।"

'ঔর কাঁহে যায়েঙ্গে বাবু—নেই শেকেঙ্গে।—' "আলবৎ শেকেঙ্গে"—বলিয়া তাহার দাড়িটা একটু টানিয়া দিলাম। আবার ঠিক। বটকৃষ্ট পাল। মাতৃমন্দির। বাবাঃ চায়ের দোকানে এখনো লোক ! ও বেটারা কে. নিশ্চয়ই গুণ্ডা—ফিস্-ফিস্ করিতেছে।

"পাহারাওয়ালাটা লাঠিতে ঘুম চাপা দিয়া রাখিয়া—বাঃ দিব্যি ঘুম ! আমার অমন ঘুম হয় না।

"ফুট্পাথে এত লোক কি করিয়া অত ঘুমায়। সারাদিনের পরে ওদের ঘুম দেখে ঈর্ষা হয়। এক-একখানা ছেঁড়া শত-মলিন চাদর গায়ে।

"একি, সিগারেটগুলা সব ফুরাইয়া গেছে এর মধ্যে। বড় গরম বোধ হইতেছে। গা ঘামিয়া উঠিতেছে। আকাশ নিরেট, ধোঁয়াটে। কুকুরের ডাক দূরে ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে। মাগো ! এইবার গঙ্গার ঘাট ঘুরিয়া বাগবাজারের খালের কাছে আসিয়া

পড়িয়াছি। গাড়ী থামাইতে বলিয়া একটু নামিয়া দাঁড়াইলাম। বাড়ী কত দূর। যাক্। আমার বাড়ি সব খানেই। কাল রবিবার, আমি মুক্ত।"

"মুক্তি চাই। সুরমার গান শুনিয়া যেদিন আবিষ্কার করিলাম তাকে আমার হৃদয়—সেদিন তার 'পানে অবাক হইয়া চাহিয়াছিলাম—। বোধ হয় মুগ্ধের মতোই—। গায়ের রং ময়লা হইলেও তো তার সৌন্দর্য্য কম ছিল না। অতি ক্ষীণ—ঈষৎ বঙ্কিম তরঙ্গিত তনুখানির মাঝে—যেন এক রাশ কমনীয়তা, এতটুকু স্পর্শে সমস্ত অঙ্গ ভরিয়া মাখিয়া গন্ধ ছুটিবে।

সে বলিয়াছিল—ডুর্—।

সে যেন আমাকে ঐ দু-টী কথায়······সুরমা অবিবাহিতা তা আমিও জানি ও-ও জানে—।

'বাবু!'—চাহিয়া দেখি ঘট্-ঘট্ করিতে করিতে মিটার, ট্যাক্সির ঝাঁকিতে-ঝাঁকিতে এক-আনা দু-আনা করিয়া উঠিয়া যাইতেছে।

ঘড়ি দেখিলাম। সাড়ে চারটা। ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিলাম—আঠারো টাকা চার আনা।

"ধীরে হাঁটিতেছি। একখানা বাস্ চলিল। গা-মাথা একটু টল্-মল্ করিতেছে। ভারী জল-তেষ্টা পাইয়াছে। সুইপার নল দিয়া জল দিতেছে। দেখিতে দেখিতে শ্যামবাজারে আসিয়া পড়িলাম। 'ওয়ালফোর্ড'—বাস্ হুম্-হুম্ করিয়া গোঙাইতে গোঙাইতে আসিয়া থামিল। আমিও চাপিলাম।······

"বেলা ৯টায় ঘুম থেকে জাগিয়া কেবল চায়ের বাটীতে চুমুক

দিয়াছি—হরে' আসিয়া 'কি বাবু !' বলিয়া জানালা খুলিয়া দিতেই এক থোকা আলো মিহি আঁচে ছোট একটু তামাসা করিয়া গেল—।

"আপনাকে ডাক্‌চেন একটি বাবু—।' আমার ভিতর-বার সমান হলেও আমি লোকজনের সঙ্গে বাহিরে দেখা করিতাম। কিন্তু কি ভাবিয়া আজ এখানেই ডাকিলাম,—'বসুন।'—'কোথায় বলুনতো ?' বলিয়া ভদ্রলোকটী নিজেই পাশের আরাম কেদারার উপরের একরাশ বই সরাইয়া রাখিয়া সেখানেই বসিল এবং তার সুটকেশটা নীচে রাখিল। যুবক,—দোহারা গঠন। চেহারার বিশেষত্ব বড় বেশী ছিল না। শুধু নাকের ছিদ্র-পথদুটী একটু উর্দ্ধ-মুখী—। 'চা-খান ?'

" 'আজ্ঞে না—ধন্যবাদ'। আমি গা-হাত-পা মোড়াইয়া বেশ করিয়া আলিস্যি ভাঙিতেই আর একপেয়ালা চা আসিল। ভদ্র লোকটী ব্যস্ত হইয়া কহিল—

"চা-টা শুধু নষ্ট হবে"।

'না ওটা আমার, আপনার নয়', বলিয়া চুমুক দিলাম। 'কিন্তু চা-তো আছেই ঐ আপনার সাম্‌নের পেয়ালায়—।'

"আমি এক পেয়ালার বেশীই চা খাই—ওটা ঠাণ্ডা।" ভদ্রলোকটী বোধ হয় অবাক হইল, চা দিয়ে তখনও একটু একটু ধোঁয়া উঠিতেছিল কিনা।—যাক্‌গে—'কি চাই—আপনার ?' 'দুয়েক খানা বই আছে দেখ্‌বেন—?' 'না, ক্ষমা কর্‌বেন, বই আমি কিনতে পারবনা—।

'—একটু দেখুন না।'

'না, না, মশাই আমার সময় নাই—।'

'তাহলে' আমি দেখাচ্ছি,' ভদ্রলোক এই বলিয়া নানা পুস্তক খুলিয়া-খুলিয়া আমার সাম্নে ধরিতে লাগিলেন—আমরা কেন নেশার জন্য মাথা পিছু ১।৷০ খরচ করিয়া বইয়ের জন্য মাত্র ৶০ আনা করিব—কলিকাতার সিনেমা-গামীরা খরচ করিবেন বছরে কুড়িলক্ষ টাকা আর একখানা বই বছরে ২০০০ বিক্রী হয় এমন বই এদেশে বেরুল না—বিলাতে ২৫০০০ হচ্ছে সব চেয়ে কম বিক্রীর সংখ্যা—এদেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেউ কি কিছু লিখিলেন না—যে অতটুকু মূল্যবান্।—

'দেখি মশাই কি বই—এগুলো যে সব 'বৃহৎ জাতিত্বের পথে' 'জাপানের সীমান্ত সঙ্কট'—এ তো ইংরেজীর কপচানো। লোকটি তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টে কহিল—'ইংরেজীগুলো সবই আপনার পড়া ?' —পর মুহূর্ত্তে বিনীত মৃদু হাসিতে সৌরভ খেলাইয়া কহিল, 'বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন—এই বাঙ্গালীর অনেকে...... বিশ্বাস করুন—অন্ধকারে চোখ যায় না, তবু বিশ্বাস করুন' লোকটি আবার হাসিল। এর হাসিতে কি একটা কথা মনে পড়িতেছিল! 'কি ভাব্‌চেন—?'

"যা-ই ভাবি মশাই আপনার অন্ধকারকে আমি পূজা করতে পারি না।" সে হাঁই তুলিল।

"কিছু মানেন না বুঝি ?"

'—হ্যাঁ মশাই আপনি কি করেন—?' ভদ্রলোক এইবার লজ্জিত হইলেন। 'আজ্ঞে, আমি কিছুই করিনা,—বই বেচে

কোন মতে বড়ো মা আর ছোট বোন্‌টার ভরণ-পোষণ—স্বার্থত্যাগ কিছু, পারিও না, চাইও না—ক্ষমা করুন এবার উঠি।

ভদ্রলোকটীর এমন একটা জায়গা অনাবৃত হইয়াছে দেখিয়া তার এই লজ্জা আমি বুঝিলাম ও বলিলাম— 'আলোকে তো এই, আর অন্ধকারে কিছু করেন না—যে অন্ধকারের খুব মন্ত্র আওড়াচ্ছিলেন—।'

লোকটা আবার একটু হাসিল। ঘামিয়া উঠিয়াছিল। ঘাম মুছিল। বইয়ের বাক্স বন্ধ করিয়া কহিল, 'ও বটে,—আমার খোঁচায় হুল্ নাই।'

'আপনি কি করেন?'

'আমি কিছু করিনা—আমাকে—মাসে···শুধু মাসে পনেরোটী লোককে খবরের কাগজ পড়বার বিদ্যা দিই আর তাদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিই—আমরা প্রত্যেকে একটি করে' লোককে এই বিদ্যে দেব—।'

'আর কিছু করেন না?' আমি মৃদু হাসিলাম।

'না, না আর কিছুই না, আমি চাই শুধু এদের ঐটুকু দিতে—সে-ও বিনিময়ে—এরা প্রত্যকে আমাকে চার্‌টে পয়সা দেয় আমি আদায় করে নিই···আমি হিসেব করে দেখেছি একবচ্ছরে আমি এম্‌নি করে চল্‌লে পাঁচশ লোক পাবো—যারা ম্যালেরিয়ায়, কলেরা, বসন্তে মর্‌বে তাদের বাদ দিয়ে—এই লোকদের ভিতরে......'

'আপনি কার শিষ্য আমি জানি...আমিও এমনি কিছু কর্‌ব। যাহোক মন্দ লাগ্‌বে না......'

'আপনি তো এঞ্জিনিয়ার—?'

'হ্যাঁ, মার্টিন কোম্পানীর।'

'মাইনে ?'

'সাড়ে আট্‌শো—'

'কত জমিয়েছেন ?'—

'জমাব কোথেকে ? নিজের খরচ—'

'চলেনা।'

সে হাসিল।

'হোক্, হোক্...আমি চাকরি ছেড়ে অম্‌নি কিছু কর্‌ব।... আমি মুড়ি খেয়ে থাক্‌ব।—আচ্ছা, টি-বি হাঁসপাতাল কর্‌লে...'

'বেশ হয়। লাগ্‌ব ? যদি বিশ্বাস করেন আমি তার...'

'কিন্তু আপনাকে......আচ্ছা আপনার বাড়ি কি বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে ? আপনার বোনের নাম, আচ্ছা...অন্য কেউ-ই-বা হবে—আচ্ছা টুনুকে আমি...জানেন ?'

'বিলক্ষণ !' সে তো আমার বোন্।

'টুনুকে আমি খুব মারতাম। ছেলেবেলায় ওর— টুনুকে... সে এখন কি করে ?'

'সে এখন ম্যাট্রিক পড়ে, লাফিয়ে বেড়ায়, আর আমার বই-গুলো কবে সে বুঝ্‌বে এই—'

'আপনিও বুঝি পড়াশুনো করেন ?'

'আমি এম্-এ পড়ি—'

'তোমার নাম অমল। ফুল্ অ্যাঁ—এসো, এসো, বোসো। জামা কাপড় ছাড়ো। চলো কাল সিম্‌লা যাই ; একটু......'

"আর টি-বি হাঁসপাতাল ?"

'আরে হবে, হবে, হবে......' "

রচনাকাল

কার্ত্তিক ১৩৩৬, কলিকাতা

শঙ্কু-কলস

শান্তি নিবাস বোর্ডিং। রমাপতির ঘর। . একটা অযত্ন-রক্ষিত টেব্‌ল, তার উপরে অসংখ্য বই, খবরের কাগজ, অ্যাস্পিরিন টেব্‌লেট্‌ লুমিন্যালের মোড়ক। ভাঙা আর্‌শী তেপায়া চেয়ার, আরাম বিহীন আরাম কেদারা ; তাছাড়া বিছানার উপরের সুজ্‌নীর অননুমেয় ময়লা, বালিসের ওয়াড়ের তেল—সব মিলিয়া ঘরের হতশ্রী আর আহত সুখ। কিন্তু রমাপতির এখনই বাহির না হইলে নয়। সে ক্রমাগত ঘুরিতেছে আর খুঁজিতেছে ঘরের এধার আর ওধার, সমানে ; তক্তপোষের নিচে, টেব্‌লের পাশে, দরজার আড়ালে—যদি একটা পোড়া বিড়িরও বোঁটা মেলে। বাস্‌ ভাড়ার এক্‌ আনা ব্যতীত হাতে তার একটা পয়সাও নাই। সে বোঁটা পাইল, সেটা জ্বালাইয়া লইয়া সে কাপড়কাচা সাবানের একটা খণ্ড আর বহু পুরাতন একটা ব্লেড্‌ লইয়া কামাইতে বসিল। কিন্তু ব্লেড্‌ দুর্ব্বল হইয়া গেছে, বহু ঘষা-ঘষিতেও গালের দাড়ী উজাড় হইল না ; বিরক্তিতে রমাপতির মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

উড়ে বয়্‌ ঘরে ঢুকিল।

'এ চিঠি আপনারঅ আছে বাবু ?'

অর্দ্ধ-চাঁচা দাড়ি লইয়া, আগ্রহাতিশয্যে সে হাত বাড়াইল। 'হ্যাঁ আমার।' বলিয়া খাম খুলিয়া সে পড়িতে পড়িতে দেখিল,

তাহার কুড়ি টাকার মাষ্টারি প্রারম্ভেই শেষ হইয়াছে—কথাটা কর্তৃপক্ষ দুঃখিত হইয়া জ্ঞাত করাইয়াছেন।

বয় প্রশ্ন করিল,

'কি চিঠি বাবু?'

রমাপতি শুনিতে পায় নাই, সে আবার ব্লেড্ ঘষিতে লাগিল, নির্ম্মম ভাবে তাহার গালে, দাঁত মুখ খিঁচাইয়া। বয়-এর হাসিও পাইতেছিল, দুঃখও হইতেছিল।

রমাপতি—তুই দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌চিস্ ওখানে?

বয়—যদি রাগ না করেন একটা কথা বলি। বাবুরা যে ব্লেড্ ফেলে দেয় সেইটে আবার কাচের এক গেলাস জলে বাহবা ঘষে' শান্ দিয়ে নিয়ে শালা জগুয়া পা ছড়িয়ে দিয়ে বাদ্‌শাহী চালে কামায়।

অন্য ঘর থেকে কে ডাকিল,

'বয়'—'বয়' বয় চলিয়া গেল।

কি ভাবিয়া রমাপতি সত্যি সত্যি কাচের গেলাসে জল পুরিয়া লইল, সত্যিই তাহাতে সুবিধা হইল। বহু নৈপুণ্যে কামানো সাঙ্গ করিয়া মুখে চোখে স্বাভাবিক শ্রী ফিরাইতে তার সময় গেল। ইতিমধ্যে চায়ের উদ্দীপনায়, চা-টা বয় দিয়া গিয়াছিল, তার প্রেমের কথা রত্নর কথা, মনে উঠিল। স্বপ্ন নামিল।

······ছোট একটা ফ্ল্যাট সে ভাড়া লইয়াছে যেন। তক্-তকে ঝক্-ঝকে, পরিচ্ছন্ন। পরিপাটী আধুনিক সব আস্‌বার-পত্রে তার বেড্-রুম ড্রয়িং রুম সব শোভমান। তৃতীয় ঘরটী ডাইনিং

ঘর বলিয়া গণ্য হইয়াছে—সেখানে নিভাঁজ 'আলোক প্রাপ্ত' সব সুন্দর এবং স্বচ্ছন্দ সংস্করণের অস্তিত্ব। ২০০৲ তাহার উপার্জন, সব সে রতুর হাতে তুলিয়া দেয়। রতুর সাড়ি কিনিতে বাসে চড়িয়া সারা কলিকাতা ঘোরে, গঙ্গায় নৌকাবিহার করে······ বেড্‌রুমের একটী কোণে কোন্ আস্‌বাব মানে ভালো, এই লইয়া তাতে আর রতুতে কথা কাটা কাটি চলিয়াছে······

বাস্তবেও কথা কাটা-কাটি চলিয়াছে, উড়ে বয় আর যুক্ত-প্রদেশীয় রাঁধুনি বামুনে।

বয়—মু পারিমুনা অবধড়, আরু কি দিব দ-অ।

রাঁধুনি—তু কোন্ রে······বাবুলোগ সব···বাগ্‌যাও উধার।

······রমাপতির ভ্রূক্ষেপ নাই। সে চা পান করিতেছে আর ভাবিতেছে—ড্রেসিং টেব্‌লটাই না-হয় কোণে বসানো হোক্, রতুর যখন তাই ইচ্ছা, তুজনে সেইটেই করিবে এখন······

ইতিমধ্যে বোঁ করিয়া রাঁধুনি বামুন দিল এক চড় কসিয়া বয়ের গালে। একটা কুকুর এঁটো বাসনের মধ্যে আহারের খোঁজে ছিল, ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়া এক লাফে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিল কিন্তু ধমক খাইয়া সত্যিই বিব্রত হইল, বুঝিতে পারিল না কি এখন সে করে ······রমাপতি পালঙ্কে শুইয়া আছে, রাত হইয়াছে। রতু এইমাত্র ঘরে আসিয়াছে; এটা-ওটা লইয়া এদিকে-ওদিকে কি যেন করিতেছে······

কিন্তু চা শেষে স্বপনও শেষ হইল। জাগিয়া সে দেখিল দোরের পাশে বয় নিঃশব্দে কাঁদিতেছে আর পান সাজিতেছে। টুক্

করিয়া একটা আনি তার কোলে ফেলিয়া দিতেই বয়-এর মুখে হাসি ফুটিল—রমাপতিরও তখনই মনে হইল—আর একটা পয়সাও রহিল না।......

......রত্নমালা যে পথে কলেজ যায় রমাপতি সেই মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। গুণ্ গুণ্ করিয়া সে গান ধরিল,

'মনের গোপনে যে বাঁশি বাজালে
সে যে মধু, সে যে মধু!
কবে দাঁড়াইবে বরণ করিবে
ওগো সাথী ওগো বধু!

এম্‌নি সময় রত্নু আসিল গুট্‌গুট্ করিয়া, ইঙ্গিত করিল, কিন্তু সে ইঙ্গিত রমাপতির চেতনায় পৌঁছিল না। আরো কাছে আসিলে সে রত্নুকে দেখিতে পাইল। চোখোচোখি হইতেই দুজনের মন খুসিতে ভরিল। রত্নমালা দেরী না করিয়া, একটা ট্রাম দাঁড়াইলে, পট্ করিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িল, রমাপতিও পেছনে পেছনে। কিছু পরেই ইহারা দু'জনে কুর্জ্জান পার্কের মধ্যে একটা বেঞ্চে আসিয়া বসিল।

রত্নমালা—তুমি ভারী বোকা, ভারী দুষ্ট, বারেবারে তোমায় বলি দাদার সঙ্গে খুব ভাব রাখ্‌বে, তা-না কেবল আমার দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাক্‌বে, দাদা এলে কথা আর ফুট্‌বেনা। ......আচ্ছা এই একটা জামা রোজ পর কেন?

রমাপতি—অনেক পর্‌ব রত্নু। তখন তোমার আমার......

চমৎকার ছোটো বাসা, আর কেউ না, কেবল তুমি আর আমি। অল্প আসবাব আর অনেক আনন্দ।

রত্নমালা—কবে ? ছাই বলোনা। দেরী হলে' সেকেণ্ড ইয়ার হবে, আবার পরীক্ষা দিতে হবে। একটুও ভালো লাগেনা, পড়া আর পড়া ; কলেজ পালিয়ে এলুম, কি আনন্দ ! দশটা টাকা আছে, চলো কিছু করে' খরচ করি......আচ্ছা তোমার চেহারা এমন হচ্ছে কেন ? চাকরি পেলেনা আজও। ২০০৲২৫০৲ টাকার একটা চাক্‌রী চেষ্টা কর্‌লে মেলেনা ? আজ দাদা আর বাবা কি বল্‌ছিল—ভ্যাগাবণ্ড্‌, ওয়ার্থলেস্‌......কি যে ইক্‌নমিক্সের এম-এ তুমি বুঝিনা—।

রমাপতি—ইক্‌নমিক্সের প্রশ্নেতো চাক্‌রির কথা জিগ্যেস করেনা রত্নু ?

রত্নমালা—কিন্তু চাক্‌রি হ'তেই হবে।

রমাপতি—নিশ্চয়ই। তাইতো আজ চেষ্টায় বেরুবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে' নিলুম। হতে'ই হবে।

রত্নমালা—এখন যাবে নাকি ?......আচ্ছা যাও, আমি একটু বালিগঞ্জ হয়ে' আসি তাহলে'।

রমাপতি—সাড়ে পাঁচটায় এইখানে থেকো। কেমন ?

'আচ্ছা।' রত্নমালা টুক্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িল। রমাপতি ভাবিল, কোনো দিন কোনো চেষ্টা করে'ও রত্ন তো একদিন তাকে 'ভালো দেখাচ্চে' বলেনা—কি হতচ্ছাড়া পোষাক তার ? কি চেহারা ?......

আপিস কোয়াটার। এধার ওধার দিয়া নানা আকার-প্রকারের বিচিত্র এবং একঘেঁয়ে কেরাণিকূল আসিয়া জুটিতেছে—কেহ ট্রামে, কেহ বাসে, কেহ রিক্সায়, কেহ ট্যাক্সিতে, কেহ কারে। চৌমাথার মোড়ে একটা মুচি জুতা ব্রুশ লইয়া বসিয়া আছে আর পদব্রতীদের পায়ের দিকে একটানা চাহিয়া দেখিতেছে। পান চিবাইতে চিবাইতে একটি বৃদ্ধ একগাদা নথিপত্র হাতে মাথা নিচু করিয়া চলিতেচে ; উদ্যমের আতিশয্যে তার নাক আর এক জনের কনুইয়ে টক্কর খাইয়া গেল ; সাহেব-বেশী ঔদাস্যের দৃষ্টিতে তাহাকে পাশে ফেলিয়া একটু জোরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ পরম যত্নে নাকে হাত বুলাইয়া লইয়া তার দিকে পরীক্ষণী দৃষ্টি সংযোজিত করিল।

রমাপতি এবাড়ি ওবাড়ি খোঁজ করিতেছে আর নম্বর পরখ করিতেছে। আর একটি বাবু তাহাকে আস্তে সরাইয়া দিয়া বলিল—'পথ ছেড়ে।'······একটা সার্জ্জেণ্ট তার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করিয়া কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিল—হোয়াট্ ডু ইউ ওয়াণ্ট বাবু ?

রমাপতি বলিল, "মল্লিক ম্যান্সন।"

'ও ইয়েস্' বলিয়া সার্জ্জেণ্ট চলিয়া গেল, রমাপতি ততক্ষণে বাড়িটা চিনিতে পারিল। প্রকাণ্ড বাড়ি, রাশি রাশি আপিস্ একটা বাড়িতে, তার প্রয়োজনীয়টা খুঁজিয়া লইতে তার বেগ পাইতে হইল। লিফ্টের কাছে আসিয়া ভিতরে ঢুকিতে যাইতেই লিফ্টম্যান গম্ভীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বলিল, 'বাঁয়া তরফ্‌সে সিঁড়ি।'

থতমত খাইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তার হাঁটু ধরিয়া গেল ; হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই চোগাচাপকান-ধারী দারোয়ান বলিল, 'কিয়া মাঙ্‌তা আপ্ ?'

রমাপতি নাম করিল এবং যথাস্থানে পৌঁছিল। রমাপতিকে দেখিয়াই বাবুটি বলিল, 'নো ভেকান্সি, জেণ্টলম্যান্।'

রমাপতি—আজ্ঞে তা'ত কার্ডে লেখাই আছে।

বাবু—কি চাই ?

রমাপতি—একটা চিঠি......

বাবু—কে দিয়েচে ? কি লিখ্‌চে ?

রমাপতি—একটু দেখুননা স্যর্।

বাবু—ও; তুমি ইক্‌নমিক্স্ জানো ?

রমাপতি—আজ্ঞে সামান্য শিখিচি।

বাবু—সুরেনকে বোলো আপাতত কিছু কাজ নাই।

রমাপতি—আমি আস্‌বো আবার ?

বাবু—ফর্ নাথিং কেন ট্রাব্‌ল, দরকার হলে'......

রমাপতি—আমার ঠিকানাটা তাহলে'......

বাবু—সে হবে।......হরিবাবু শুনুন......

রমাপতি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বুঝিল সে খুব বোকার অভিনয় করিতেছে—সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় পড়িল। হটাৎ মনে হইল বিদায়-সূচক নমস্কার না করিয়া সে আসিয়াছে, কিছুকেই অবিশ্বাস ভালো নয়—কাজ হইলেও হইতে পারে। সে আবার উঠিতে লাগিল, ভাবিল, এই 'হইলে-হইতে-পারে'

সে গেল পাঁছ বছর কি-ই না করিয়াছে বড়লোকের মন মজাইতে। যাক্, নমস্কার করিয়া সে বুঝিল, এ নমস্কার বাবুর কত সহজ প্রাপ্য—বৃথাই সে আর একটু পরিশ্রান্ত হইল মাত্র।

দরজার বাহিরে আসিতেই একটি বিধবা তার পথ আগ্‌লাইয়া ধরিল, বাবা আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, শ্বশুর আমার ডাকসাইটে জমিদার ছিল বাবা······মেয়েটা······

রমাপতি—কি কর্‌বেন, আমাকে বলে' লাভ নাই।

বিধবা—একটা সিকি হলে'······

রমাপতি—কাণাকড়িও নাই মা; নিজেই ঘুর্‌চি একশো ধাঁন্দায়

বিধবা—তোমার সোনার ঘর বাড়ি হোক্ বাবা। তোমার লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা থাক্······যা পারো একটা আনি······

রমাপতি ভাবিল যত ভিখারিণী সব ডাকসাইটে জমীদারের পুত্রবধু! বিরক্ত হইল। বলিল, বুঝ্‌ছেন্‌না। কিছু নাই আমার। সে তার সমস্ত পকেট ঝাড়িয়া দেখাইল, 'এবার বুঝ্‌চেন পয়সা নাই।'

বিধবা মুখ বেঁকাইয়া ভাবিল, 'অলক্ষ্মী না পেলে অমন হয়। অল্‌পেয়ে বলেই······' ভয় পাইল, 'আজ ভালো লগ্নে বার হতে' পারে নাই বলেই কি······'

রমাপতি কি ভাবিয়া তার পরম বন্ধু বড় চাক্‌রে ননীগোপালের আপিসে গিয়া উঠিল। ননীগোপাল পরম আদর জানাইল; বলিল, বাজার বড় খারাপ, শক্তি আর যোগ্যতা ছাড়া কিছু হওয়ার উপায় নাই; এই সামান্য ৩০০৲।৪০০৲ টাকার জন্য তাকে কি যে

মস্তিষ্ক ব্যয় করিতে হয় কে বলিবে ? তবে রমাপতির জন্য টাকা পঞ্চাশের একটা চাকরী চেষ্টা করিতে পারে মাস দুই পরে। তবে তাতে খাটুনি বেশি। রমাপতি স্বীকৃত হইল তাহাতেই এবং এতই হাল্‌কা বোধ হইতে লাগিল তাতে, যেন চাক্‌রি সে পাইয়াছে।

খানিক ঘুরিয়া ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গোটাকয়েক বই নাড়া-চাড়া করিয়া সাড়ে পাঁচটায় সে আবার কুর্জ্জান পার্কে আসিয়া দাঁড়াইল।

অপেক্ষা করিতে করিতে রমাপতির পা ধরিয়া গেল। কিছু পরে রত্নমালা আসিয়া উপস্থিত হইল ; মুখে হাসি দেহে লীলায়িত আনন্দ—

রত্নমালা—না ; এখন কিছু ব'লোনা। আমার যা শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্চে, এই রিকসা—এসো এতে চেপে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে……

রমাপতির মনের সাম্‌নে চাক্‌রির স্বপ্ন ভাসিতে লাগিল, সে কি বলিতেছে, না ভাবিয়াই বলিল, আমার চাক্‌রি হয়েচে রত্নু।

রত্নমালা—হয়েচে। বাঁচ্‌লুম্। কবে তাহ'লে আমরা তেম্‌নি করে থাক্‌ব ?

রমাপতি—কিন্তু তোমার বাবা আমার সঙ্গে আপত্তি কর্‌বেন্ না তো। আমার কেউ নাই ; গরীব……

রত্নমালা—ধ্যেৎ। আপত্তি কিসের ? তুমি বীরের মত প্রোপোজ্ কর্‌বে। মাইনে কত হ'ল ?

রমাপতি—আপাতত পঞ্চাশ টাকা।

রত্নমালা—পঞ্চাশ টাকা—পুও……

রমাপতি—এতে কোনো রকমে দুজনের চল্‌বে না রত্ন ?

রত্নমালা—না বাবা, অমন কুকুর শেয়ালের মত পারবো না… দাঁড়াও, এই…তুমি যাও, আমার এইখানে একটু দেরী হবে। রত্নমালা চলিয়া গেল।

যাইবে তো—কিন্তু ট্যাঁকে তার একটা পয়সাও নাই যে। উপায় নাই, সে রিকসাওয়ালাকে উল্টা তাহার বোর্ডিংএ লইতে নির্দ্দেশ দিল। বোর্ডিংএ পৌঁছিতেই সুরেশের সঙ্গে দেখা, সে বলিল—কি হে আজকাল রিক্‌সা ছাড়া চলাচল হয় না, কি ব্যাপার ?

রমাপতি—ব্যাপার আশার। চাক্‌রি পেয়েচি। রিক্‌সা ভাড়াটা আজ তোমায় দিতে হবে।

সুরেশ—এক ফার্দ্দিং নাই আমার কাছে—সরি।

রমাপতি নিরুপায়। রমাপতি নিরব। রিক্‌সা ঠং ঠং শব্দ করিয়া তার চাহিদা জ্ঞাপন করিতেছে। উপায়হীনের উপায়, রমাপতি চট্‌ করিয়া বাথ্‌রুমে ঢুকিল।

……রত্নমালার প্রসাধনকক্ষ। ক্রীম পাউডার রুজ, পমেটম্‌ নিউভিট, এবং আরো সব অত্যাধুনিক মার্কিন দেশীয় রঞ্জন দ্রব্যে তার এ ছোট ঘরটী পরিপূর্ণ। কতকগুলো শাড়ী ড্রয়ার থেকে বার করিতেছে আর মেঝেতে ফেলিয়া দিতেছে—। কিছুতেই কোনটাই তার পছন্দ হইতেছে না। ঝি আসিয়া বলিল আজ কোথায় যাবে দিদি, সে বলিল, 'ভাগাড়ে' খোঁপা সে বর্ম্মী

কায়দায়ই অতঃপর রচনা করিল—। এমন সময় এক পেয়ালা ওভালটীন তৈরী করিয়া ধরিতেই সে এক চুমুক খাইয়াই বিরক্ত হইল—এ ছাই কেন আনিস্? 'বোর্ণভিটা?' ঝি বলিল। ইতিমধ্যে সে হাতঘড়িটার দিকে তাকাইয়া বুঝিল সময় হইয়াছে। ঋজু প্রান্তহীন আর্শীতে আর একবার মুখটা দেখিয়া লইয়া সে সাড়ীটা এইবার পরিল—। কর্সেট বডিস্, পেটিকোট তার পরা ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে—পা দিয়া সাড়ীগুলো একপাশে সরাইয়া দিয়া সে বাহির হইল দ্রুত এবং উদগ্রীব পদক্ষেপে।

…মেয়েদের কলেজ। প্রশস্ত কমন্ রুম, টেব্‌ল চেয়ার, বেঞ্চ আরাম কেদারা মায় শুইবার তক্তপোষও আছে এখানে দুই খানা। ইতস্তত খবরের কাগজ ছড়ানো,—কেহ ক্রমাগত কথা কহিতেছে, কেহ কেবল হাসিতেছে, কেহ নিশ্চিন্তে পড়িতেছে, কেহ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে।

শান্তি—আমি জোর করে বল্‌ছি এম বি'র সঙ্গে রমার বিয়ে।

লীলা—হ্যাঁ ঐ পেঁচামুখোকে কে বিয়ে কর্‌বে?

মালতী—যাই ভাই, আই বি গুপ্তের লজিকের ক্লাস নষ্ট কর্‌বো না কিছুতেই।

উষা—ঢের হয়েছে মরি-মরি।

সুনীতি—মায়া দেখ্‌তে যাবি?

রাধু—আমি যাব—

নমিতা—আমিও যেতুম ভাই।

রেণ—আমারও যাবার খুব ইচ্ছে।

সুধা—তিনটের সো-তে চল্ সব

রমলা—আমাদের মিসেস্ প্রফেসরের মুখটা কি মিষ্টি ভাই!

কমলা—তুই খেয়ে আয়গে যা।

আভা—মিষ্টি কেমন জান্তে হলে' মিষ্টারকে জিজ্ঞেস করো।

রত্ন—আমার দাদা আস্‌বে তার সঙ্গে যেতে পার ইচ্ছে হলে'।

শান্তি—চমৎ—কার। চলো সব, এক এক ক'রে বেরুতে হবে।

কলেজের বাহিরে রমাপতি পায়চারি করিতেছে। আর প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে একটী ছোক্‌রা এই মাত্র একটী দাঁড়ানো বাসের ধারে ছাগলীর গলা অনুকরণ করিয়া ভিক্ষা করিতেছিল হঠাৎ কি মনে হইয়া সে রমাপতির কাছে আসিয়া ছাগলীর কণ্ঠ অনুকরণ করিতে তৎপর হইল।

রমাপতি—সরো বাবা, আমার গায়ে কি লেখা আছে, আমি ভিক্ষে দিই—সব কলকেতা সহরের?

বলিতে বলিতে স্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গায়ের ওপর পড়িল। তিনি দাঁত বার করিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, হেঁ, হেঁ, দেখ্‌তে পাওনা ছোক্‌রা? এঁ, মেয়ে কলেজের সাম্‌নে এলেই মাথা খারাপ হয়?

রমাপতি—আজ্ঞে মাপ করুন।

বৃদ্ধ—আজ্ঞে অনায়াসে।

ইতিমধ্যে অন্যান্য মেয়েসহ রত্নমালা এককোণ হইতে রমাপতির পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

রত্নমালা—কি হয়েচে রমাপতিদা, তোমার জামায় এ সব কি ?

রমাপতি—এই…এই…এই…

রত্নমালা—থাক্…শীগ্‌গীর একটা ট্যাক্সি ডাকো…এইতো… ট্যাক্সি আসিলে রত্ন বলিল, মায়াই দেখ্‌তে যাবিতো ?

মাধবী—হুঁ, চল্‌না।

সিনেমা গৃহের সম্মুখ ভাগ। মায়ার বিংশতি সপ্তাহ চলিতেছে। চতুর্থ শ্রেণীর জান্‌লার সম্মুখে ভীষণ ভীড়—এইমাত্র একটী অজ্ঞান লোককে টানিয়া বাহির করা হইল। অপর একটী লোকের জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে সে কোনরকমে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া করুণ ভাবে ছেঁড়া জামার দিকে লক্ষ্য করিতেছে। অপর একটী একজনের কাঁধের উপর দাঁড়াইয়া টিকেট কিনিতেছিল এই মাত্র হাত বাড়াইয়া টিকেট পাইয়া লাফ দিয়া কাঁধ হইতে পড়িল। মেয়েরা অবাক হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছে।

শান্তি—কি বিশ্রী—! বাব্‌বা।

লীলা—আমার রীতিমত গা জ্বালা করচে—মনে হয় আচ্ছা করে' চাব্‌কে দিই—

মালতী—কেন এই হয় জানিস্? কে কত রাত্তির করে' দেখেচে তারই পাল্লা দেবার জন্য !

উষা—বেশ, কিন্তু অমন করে' মরিয়া হয়ে টিকেট কেনার মানে পাইনেকো।

রমাপতি—ওদের টাকা নাই।

লীলা—(জনান্তিকে) রত্নর দাদা এতক্ষণে কথা কয়েচে ভাই।

রত্ন—টিকেট কেন রমাপতি দা।

রত্ন তাহার পার্স আস্তে সকলের অসাক্ষাতে তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল।······

রত্নমালার বাড়ির একখানি শয়ন কক্ষ। রত্নমালার মা ফোন করিতেছে।

মা—কই এখনো পৌছেনিতো—দরওয়ানকে ডাক্‌তো লা।

দরওয়ান—মাজী।

মা—দেখ্‌খো—রত্নু কলেজসে আয়া নেহি কাহে?

দরওয়ান—জি আচ্ছা।······

সিনেমা শেষে রাস্তার ধারে ভিড় জমিয়াছে। রত্ন ও অন্যান্য মেয়েরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েরা এখনই বাসে চাপিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবে। একটী মেয়ে বলিল, আপনারও কিন্তু এই নাচের সভায় নেমন্তন্ন রহিল। 'হ্যাঁ' বলিতে বলিতে রমাপতি নামিয়া পড়িল। রত্নর বাড়ীর কাছে আসিয়া রমাপতি বলিল, তুমি নাচ জানো রত্নু?

রত্ন—জানি। তুমি এখান থেকেই যাও। এখনও সন্ধ্যা হয়নি। আমি একাই যাবো।······

শান্তি নিবাস। হরিপদর ঘরে বিরাট তাসের আড্ডা বসিয়াছে। রমাপতি আড্ডা থেকে সরিয়া একপাশে কি একটা বই পড়িতেছে। বয় আসিয়া রমাপতিকে জানাইল, ম্যানেজার বাবু ডাকিতেছেন—।

ম্যানেজার—এই যে রমাপতি বাবু!

রমাপতি—নমস্কার।

ম্যানেজার—নমস্কার। তা এপ্রিলও যায় যে। আমাদের প্রতি একটু দয়া করুন। একটা তারিখ অন্তত ঠিক করে বলুন।

রমাপতি—ইচ্ছে করে' কি কেউ বেঠিক করে ম্যানেজার বাবু।

ম্যানেজার—কি কর্ছেন ভাব্তে পারি না। একটা common courtesyওত আছে। আমার দিকে কি কেউ দেখে? কর্পোরেশনে ট্যাক্স না দিলে জিনিষপত্র বেচে নিয়ে যাবে যে। একটু দয়া করুন।

ম্যানেজার বাবু চলিয়া গেলে সদাপ্রফুল্ল গিরীশ বাবু বলিল, আরে এসোনা বাবু খেলি, ম্যানেজার বাড়ির লেসি এরা আলাদা জাতের লোক। কুচ্ পরোয়া নাই—চা নিয়ে আয়তো হরে'।......

ভোটের মরসুম। চারিদিকে আয়োজন ভোটের। 'ভোট্ ফর্ কংগ্রেস' 'ভোট বি সি মিত্র' ইত্যাদি বলিতে বলিতে হাঁকিয়া যাইতেছে দুইকণ্ঠে সরু মোটা কণ্ঠে। শচীন একটা মোটরের সর্দ্দার। গাড়ী দাঁড় করাইয়া সে একটা উকিলকে কংগ্রেসের ভোট দেওয়ার জন্য জেদ করিতেছে—জানেনতো কংগ্রেস কি আর কে? —এ ভারতের প্রতিনিধি যে, মূক জনের কণ্ঠ যে,—জাতির অস্থি যে, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের আজ বিরাম নাই এ কথা ঘোষণা করবার। কি দরকার আছে—বোঝাতে আপনাকে চাইনে—আপনি জানবেন—শচীন কম্বু কণ্ঠে বলিল, 'ভোট ফর্' লরির ছেলেরা বলিল 'কংগ্রেস।' ঠিক এম্নি সময় রমাপতি আসিয়া জুটিয়াছে। তার বন্ধু, শচীন।

রমাপতি—শচীন তোমাকে দেখবো এম্‌নি করে' জানিনি ; তুমি কংগ্রেসের ক্যানভাস করছো এ যে ধারণাতীত—।

শচীন -পয়সা পেলে সব করি বন্ধু। বেশ কালই তোমার সঙ্গে দেখা করচি—চিম্‌ড়ে ছুঁড়িটাকে দেখ্‌চি এখনো ছাড়্‌তে পারনি ।

রমাপতি—কি যে বলো ?—

শচীন—অম্‌নিই বলি আমি, চলোনা আমাদের সঙ্গে এই গাড়ীতে চুপ করে' বসে থাক্‌বে—

লরির বালক—শচীনদা আসুন—

শচীন—চলো কথা কইব আজ তোমার সঙ্গে—টাকা আস্‌বে হে, টাকা—বেকার হয় বোকা। চলো—

আবার 'ভোট ফর্‌।' 'কংগ্রেস'—লরি বোঁও-ও শব্দ করিয়া পাক খাইয়া চলিল।……

রমাপতির কাজ হইয়াছে প্রেসের প্রুফ্‌রীডারীতে। একটা ছাপাখানা—হু হু করিয়া কল চলিতেছে এবং নানা দিকে নানা ভাবে নানা ধরণের ছাপা জিনিষ বাহির হইতেছে ; কোনখানে ভিজে কাগজ, কোনখানে গেলি—এদিক ওদিক মেসিনম্যান ঘুরিতেছে —ওদিকে একটা দেওয়ালে একটা বড় ক্লক। তারের বেড়ার মধ্যের দুয়ারে অপর পাশে প্রুফরীডারের দল প্রুফ সংশোধনে লাগিয়া গিয়াছে—কেহ চা খাইতে খাইতে মৃদু গল্পও চালাইতেছে। কেহ শুধু খবরদারি করিতেছে—রোয়াকে বেল বাজিয়া ক্রমাগত ডাকা হইতেছে—কেহ আসিতেছে কেহ যাইতেছে—।

কলিং-বেল বাজিল ম্যানেজারের ঘরে। আর এক তারের বেড়ার ওধারে তিনি ফোনে সাড়া না পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। কি একটা জরুরী কাজে Connection ঘটিলনা জন্য তিনি ফোন্‌টা জোরে রাখিয়া দিলেন। একটু পরে রমাপতিকে ডাকাইলেন। এ ম্যানেজারের গাম্ভীর্য্য ভুঁড়ি এবং ছোট চোখ সব মিলিয়া অগাধ মমত্ব-হীনতাই সূচিত করে। রমাপতি আসিলে তিনি বলিলেন—আপনি আজই appoint হয়েছেন।

ঢোক গিলিয়া রমাপতি বলিল আজ্ঞে, হ্যাঁ।—

'আপনি ইকন্‌মিক্সের এম-এ ?—'

'আজ্ঞে'।

হা হা করিয়া ম্যানেজার বাবু হাসিয়া কহিলেন, আমরা এম-এ চাইনে—আমরা চাই correct proof-reading। আপনি আর কাজে আস্‌বেন না—।

'আজ্ঞে এবারটা একটা chance দিন—'

'কিন্তু আপনার Testimonial বলে আপনি নাকি experi-enced.'

'আজ্ঞে তা,—তা।'

'মনে রাখ্‌বেন এ ব্যাপারে আমি আর consider করতে পারবোনা—। এটা কাজ, এখানে ভিক্ষে চলেনা।'……

……মিনিষ্টার দত্ত চৌধুরীর বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড হলে বহুলোক সমবেত হইয়াছে। একটা মৃদু জলযোগ শেষ হইয়াছে এবার নাচ সুরু হইবে। বিশিষ্ট অতিথি সব একদিকে সমবেত

হইয়াছে। অপর দিকে দামী কার্পেট পাতা, এক কোণে একটু আবডাল, সেইখানে নাচের জন্য প্রস্তুত শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মহিলারা অপেক্ষা করিতেছেন। মিনিষ্টারপুত্র অনিমেষ তাঁদের কোন কষ্ট না হয় তাহাই তদারক করিতেছেন। দত্ত চৌধুরী একটি প্রকাণ্ড মানুষ। কথা বলিতে হাঁপাইয়া উঠেন। ঠোঁট দুটি পাত্‌লা, কোন রকমে একটু ফাঁক করিয়া আর বন্ধ করিয়া হাসির অভিনয়ে তিনি সবাইকে আপ্যায়িত করিতেছেন। শীতের মরসুম গতাসুপ্রায়, তবু তাঁর শীত রক্ষার চেষ্টা সারা দেহে প্রকট। এ-শীত একেবারেই গণ্য না করিয়া মেয়ের দল লঘু পোষাকের হিল্লোল তুলিতেছেন। চারদিকে ভুরভুরে মধুর গন্ধ। একটা গান এইমাত্র শেষ হইল। নাচ্ সুরু হইবে। রমাপতি কার্ড দেখাইয়া ঢুকিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে বুঝিল, রত্নুই সাজিয়াছে—সব চেয়ে মনোহর রূপে এবং অনিমেষ তাহারই তদারক করিতে পরম ব্যস্ত। নাচ চলিল—জোর। রত্নমালার নাচ বিশেষ করিয়া সকলের প্রশংসা আকর্ষণ করিল।

বৃদ্ধেরা চক্ষু মুদিল নবীনেরা চপল হইল। নাচের আসর প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় রমাপতি দেখিল মিনিষ্টার দত্ত চৌধুরী রত্নমালাকে কাছে ডাকিয়া সুখী করিতেছেন, মিষ্টি হাসিতেছেন এবং আবার আসিতে অনুরোধ করিতেছেন মাঘী পূর্ণিমাতে। রত্নমালা এখনই বিদায় হইবে। কোন রকমে একটা ফুরসুৎ পাইলে রমাপতি বলিল—দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তোমার এত আলাপ রত্নু, ওঁকে আমার একটা চাক্‌রীর কথা বলনা!

কঠিন স্বরে রত্নমালা বলিল—পাগল তুমি!

রমাপতি ভড়কাইয়া গিয়া আস্তে গা ঢাকা দিল। রত্নমালা বৃথাই হাসিতে লাগিল। অনিমেষ অবসর বুঝিয়া বলিল—কি, এত হাস্‌ছেন মিস্ চ্যাটার্জ্জি?

রত্ন—হ্যাঁ। মিস্ চ্যাটার্জ্জি কাঁদ্‌বে নাকি?

অনিমেষ—কখনই না; তবে আমার সঙ্গে মিল্‌লে তবে তাকে বলা হবে হাসাহাসি।

রত্ন—এত ভরসা ভাল নয়।

অনিমেষ—অভরসার মতই বা কি এমন পথে বসেছি?......

শান্তি নিবাস বোর্ডিং। রমাপতির অপ্রসন্ন দেহে মনে অগাধ শ্রান্তি। ঘুম ভাঙিয়াও উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না। এইমাত্র শচীন আসিল।

শচীন—বোর্ডিংএর বাকি তোর কত?

রমাপতি—২৩৷৵০ মত হবে বোধ হয়।

শচীন—এই নে। দিয়ে, রসিদ নিয়ে, দু পেয়ালা চা, কিছু খাবার-টাবার আনা।

রমাপতি—বাঃ।

শচীন—ওয়াণ্ডার্ থ্যাংকস্‌গিভিং পরে হবে—যা।

রমাপতি চলিয়া গেলে শচীন হরিপদর দারিদ্র্য অনুমান করিতে লাগিল। টেবিলের ওপরে, বিছনার তলায়, সর্ব্বত্র শ্রীহীন নিরানন্দ, একটা কাগজের মোড়কে ইনস্যুরেন্সের খাম, অপর দিকে বিজ্ঞাপনের ক্যান্‌ভাসিং ফরম, পেল্‌ম্যানিজ্‌মের কাটিং; বোম্বে

ক্রনিকেলের ঠিকানায় একটা অর্থনীতির রচনা লেখা, ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রীর ফর্ম, সস্তায় সাবান শিক্ষা পদ্ধতির হদিশ, আরও······রমাপতি ঢুকিল।

শচীন—তুই দেখ্‌চি কিছু আর বাকি রাখিস্‌নি।

রমাপতি একটু হাসিল, নিস্প্রভ, করুণ। বলিল, কিন্তু কর্‌তে পার্‌লুম না······

শচীন— কাজের কিছু করিস্‌নি।

রমাপতি—এ বাজারে কাজের কিছুই নাই—।

শচীন—আলবাৎ আছে। দুর্ভিক্ষের ভিক্ষে, রেস্‌খেলা, ভোট, নেতার গুণকীর্ত্তন করে' বেড়ানো······ঘেন্না হচ্চে! কিন্তু যে টাকা তোকে দিলাম তা কাল সকালেও আমার ছিলোনা, রাত্তিরে পেয়েছি।

রমাপতির চোখের সাম্‌নে একটা বীভৎস দৃশ্য যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অর্থোপার্জ্জন যেন এক টুক্‌রো মাংস, আর মানুষ যেন কুকুর, কামড়াইবার কোনো উদ্যোগে তার ক্লান্তি নাই—।

শচীন—ঐ চিম্‌ড়ে ছুঁড়িটার কথা ভেবেই তুই মর্‌লি। ভালোবাসা একটা বিশ্রী রোগ, মানুষের স্বাস্থ্য থাকেনা। অথচ কায়দামত এ রোগটাকে ভাঙিয়ে নিতে পারলে, লোক বড়লোক হয়। জানিস আমি এমাসে ১৭০০৲ উপায় করেচি। এই একমাসে।

রমাপতি—তোর কাজ?

শচীন—ননসেন্স, উইক্-হার্ট !……তুই ভুগ্‌বি, কিন্তু আপিম খাস না যেন, মুস্কিলে পড়লে খবর দিস্‌……এই ঠিকানা।

শচীন চলিয়া গেল।

হরিপদ দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিল। আর্শীটা লইয়া মাথা আঁচড়াইল। আপন মনে তার মুখ হইতে বাহির হইল।

……কেউ নাই আমার। কারুর নই আমি।

জামাটা পরিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

……রত্নমালার বড়ীতে মহা ধুমধাম। বাদ্যোদ্যম, গণ্ডগোল, ছুটো-ছুটি, চারিদিকে আলোয় আলো, আনন্দ। ফটপাতে অসংখ্য চেয়ার পাতা, দামী ভদ্রলোক, দামী কথা, দামী পান সিগারেট। চা বিতরণ করিতেছে ঘন ঘন। রমাপতি আসিতেছে। সে বুঝিতেছে না কি ব্যাপার। হটাৎ রতুর দাদার সঙ্গে তার দেখা।

"এই যে রমাপতি বাবু। ভারী ভুল হয়ে' গেছে। রতুর বিয়ে, অথচ আপনার ঠিকানা……কোথায় থাকেন বলুন তো ? আসুন, আসুন।"

রমাপতি হাসিল, বলিল—'ও।'……

সুসজ্জিত মোটারে অনিমেষ আর রতু। এই মাত্র মোটার ছাড়িল। রমাপতি চলিল, ক্রমাগত ; পিছনে চাহিল না।

রত্নমালার মেজ দাদা তখন তার প্রিয় কুকুর লইয়া শীষ্ দিতেছে আর আদর করিতেছে।

রচনাকাল
কলিকাতা, ১৯৩৬।

সদর-অন্দর

হরিহরবাবু মস্ত লোক। মস্ত তার বাড়ী, মস্ত তার ভুঁড়ি, মস্ত তার জুড়ি গাড়ী—আর এই মস্ত মস্ত বস্তু গুলোর সঙ্গে তুলনায় প্রায় ফাউয়ের মত ছোট্ট একটু খানি প্রাণ। উপকরণ গুলিও সব গণিতের অনুপাতে। বাড়ীটা প্রকাণ্ড একটা ইট-কাঠ-রঙের মরুভূমির মতই বা ভয় জন্মায়, তাই আরো কিছু ব্যয়-বাহুল্যে দৃক্‌পাত না করিয়া স্থানে-স্থানে দোরে দেউড়ীতে সদরে-অন্দরে, ভাড়া করা লোক সাজিয়া রহিয়াছে—কেহ অযথা 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলিয়া, কেহ ঘাড় নামাইয়া, কেহ বন্দুক তুলিয়া, কেহ হৈ-চৈ করিয়া ক্রমাগত সিনেমা-ছবির মত চলিতেছে এবং অচল হইতেছে। মস্ত জুড়ি গাড়ী গুলো শুধু অপেক্ষাই করিতেছে। আর ঘোড়া গুলো কেবল মাঝে মাঝে ন্যাজ নড়াইয়া চিবাইয়া-চিবাইয়া চিঁ-হিহি করিয়া উঠিতেছে—এভাবে রাখা চলেনা তাই আরো কিছু করিয়া কতক-গুলো সৌখীন ফরমাস মুহুর্মুহু সৃষ্টি হইতেছে, এবং সৌখীন ভাবে একপাল নিরীহ দ্বিপদ দ্বারা আর ঐ জুড়ি গাড়ী দ্বারা কিছু হইতেছে, নইলে সবাই কি ফাঁকি দিবে? তৈলমসৃণ ভুঁড়িটি দিনের পর দিন যে ভাবে মসৃণতর হইয়া চলিয়াছে তাহাতে, ইহার পরে অন্তরের ফাঁকটুকু যে বুঁজিয়া যাইবে, তাই একখানা 'মাষ্টার বুইক' গাড়ী এবং একজন আহুরে গাড়োয়ান রাখিতে হইয়াছে—

কি করা যায়, একটু হাওয়া খাইয়া না বেড়াইলে ভালো হজম হয় না, ভালো নিদ্রা হয় না – আর মাঝে মাঝে ক্রীড়া-কৌতুক না হইলেও চলে না।

ছোট প্রাণটুকু ছোট আরামে ইহারই ভিতরে ঘুমায়, আর সমস্ত প্রাচুর্য্যকে অনর্গল বহিয়া আনে সাবধানে তার চারদিকে—। বুদ্ধি দেয় জোর পাহারা—কিছু ছিট্‌কাইয়া পড়িবার উপায় নাই বাহিরে। ভিখারীরা জোচ্চুরী করিয়াই আসে চিরদিন—বন্যায় ভিক্ষার ঝুলি, সম্মুখে পতাকা, ঢের দেখা গিয়াছে। ওগুলো রোজগারের নতুন পথ। স্বদেশী করা মানে পেট মোটা করা আর নাম জাহির করা, বাজে কাজে চাঁদা দেবার টাকা এত সস্তা নয়, ইত্যাদিতে সমস্ত বুদ্ধি বর্ম্ম পরিয়া দেয় প্রাণের পাহারা —এতটুকু ব্যাঘাত না পড়ে সেখানে।

হরিহর বাবু কাজের লোক, স্বপন দেখা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। জগৎটা আছে, ছিল ও থাকিবে—কিন্তু যা কিছু অদল বদলের দরকার তা ঈশ্বরই করিতেছেন—মানুষের কর্ত্তব্য সেই উদ্দেশ্যটাকে সার্থক করা। তাই তিনি রাত পাঁচটায় উঠিয়া বহুক্ষণ ঈশ্বরোপাসনায় কাটান এবং ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব তিনি হেলা করিতে পারেননা তাই সংসারের বিরাট বোঝা সাদরে বহন করেন— তবু তাঁর নায়েব-গোমস্তা অধর্ম্ম করেন, তিনি তাহা বোঝেন কিন্তু ধরিতে পারেননা তাই—নইলে—কি এক অপরাধে, তিনি কোন একটা কর্ম্মচারীকে ধরিতে পারিয়া তাকে শ্রীঘরে ঠেলিয়া দিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন—ন্যায়ের মর্য্যাদা তিনি বোঝেন। রায়

বাহাদুর, স্যার ডকটর, উপাধিগুলা তাঁহাকে তাঁহার সৌর্য্যে-বীর্য্যেই লাভ করিতে হইয়াছে।

ইঁহার গৃহিনী তরলিকা তরলিকাই বটেন। ছলো-ছলো হাসিয়া, ঢলো ঢলো চাহিয়া চকিতে চকিতে ভাসিয়া বেড়ান। বয়স ত্রিশ পার হইয়া চল্লিশের দিকে লজ্জিত পদক্ষেপ টানিয়া লইতেছে, কিন্তু আঁটিয়া-সাঁটিয়া তিনি প্রাণ-পণে তার রশ্মি-সংযম করিয়া রাখিয়াছেন। মুখে অপর্য্যাপ্ত রং মাখিয়া এবং আরো অনেক স্থান-বিশেষে, স্থানবিশেষের দ্রাবক ব্যবহার করিয়া, ভোগের যন্ত্র গুলোকে বিকল হইতে দিতেছেন না—সম্মুখের দশন যুগল হঠাৎ বেয়াদবী করিলে তিনি দন্ত-মিস্ত্রির দোকান হইতে তখনই লোকসানটা পুরাইয়া তবে অন্নজল গ্রহণ করিয়াছেন। করুণা তাঁর সাধের ঝি—নির্ব্বিচারে টাকা ছড়াইয়া তাকে খুসী করিতে তরলিকা মুক্তহস্ত – করুণাও নানারকমের উল্টো কথা উল্টো করিয়া বলিয়া প্রভু-পত্নীর মনোহরণ করিত, দ্বিধা করিয়া কর্ত্তব্য ভুলিত না।

সেদিন শনিবার। ঘসিয়া-মাজিয়া, বার্ণিশ হইয়া, নিজেকে বাঁধিয়া-কষিয়া তরলিকা চলিতেছে তার দূর সম্পর্কের বোনের বাড়ী। করুণা একরাশ হাসিয়া বলিল, যা-ই বলোনা মা-মণি তোমার এ রূপ-যৌবনে কি-ই বা হলো—? তরলিকা ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া কহিল—কি যে বলিস্ ?

করুণা একটু ঢুলিয়া কহিল—মারো, কিন্তু মারলে করুণা কথা ভোলেনা, একবার চেয়ে দেখোতো আর্শীর সামনে, এমন

রূপে কোন্ বেটার না মাথা ঘুরে আসে? আর তোমার কিনা, যা-ই বলো, কর্ত্তাবাবু এর কি বুঝবে? একে রেখে-ঢেকে-চেখে যে ভোগ করতে পারবে তার এতে মজা চাই, আর কর্ত্তাবাবু—

এক প্রকার কণ্টকিত আরামে তরলিকার দেহটা শির্ শির্ করিয়া উঠিল, এক প্রকারের আর্ত্তক্ষুধায় তাহার বুকখানা চাপিয়া যাইতে লাগিল, সে করুণার মুখ চাপিয়া ধরিল—দূর হতভাগি!

মনে পড়িল চোদ্দ বছর হইতে সে এই বাড়ির বধু, সাজিয়া গুজিয়া সে শুধু ছবির মতনই এবাটির একটা সৌষ্ঠব হইয়া আছে—তার স্বামী বাজে বলেননা বা চলেননা শুধু কাজ শুধু অর্থ—কিন্তু কি হবে ছাইয়ের টাকায়? বোনের বাড়ী যাওয়া আর হইল না—প্রবল ক্ষোভে সমস্ত পোষাকের বাণ্ডিল উন্মোচন করিয়া প্রকাণ্ড আরসীটার সম্মুখে দাঁড়াইল তরলিকা—কিসের তার হাসি? কিসের তার সখ? কি সম্বন্ধ তার এই বাড়ীর সঙ্গে? তার স্বামীর সঙ্গে? কি চায়ই বা সে? যা-ই চায় না কেন, তার উন্মুক্ত অবনমিত যৌবনটাকে ধরিয়া তার স্বামীর উন্মত্ত রাক্ষসের মত বর্ষ বর্ষের ক্রীড়ার ইতিহাস আজ দেদীপ্যমান্ হইয়া উঠিল—কোথাও তার এতটুকু তৃপ্তি নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই, আছে শুধু মরুভূমির ক্ষুধা। একটা সন্তান যদি থাকিত? হায় তাহার মত অভাগিনী আর কে আছে? তাহার গালে আজ টোল খাইয়াছে, তার লালিমা আজ পড়ো-পড়ো চোখ ছুটোতে আর সে উৎসব রচিবার উপায় নাই, বুক খানা ভগ্নাবশেষ প্রভাতের মতো, ফাটিয়া-পড়া, গৌরব তাহাতে নাই, আছে শুধু তপ্তুতা।

তরলিকা খুব কাঁদিল—বোধ হয় বাইশ বৎসর পরে আজ প্রথম কাঁদিল—প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

প্রায় মাস তিনেক পরের ঘটনা।

তরলিকা তাহাদেরই বাড়ীর ড্রাইভার অরুণকে তেতলার নিজের সুসজ্জিত শয়ন ঘরের সম্মুখে বসাইয়া নানাবিধ ভোজ দ্রব্য আগাইয়া দিতেছে। অরুণের বয়স ২৫।২৬, সুঠাম, বলিষ্ঠ গঠন, ড্রাইভারসুলভ নির্লজ্জতা-বিহীন। অরুণ মুখখানা তুলিয়াই বলিল, আরো দিচ্ছেন!

'হ্যাঁ এইটে খেলেই—'

তরলিকা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া বলিল, 'তোমাকে রোজ খাওয়াই কেন জানো?'

'আজ্ঞে, না,—।'

'তুমি যে ব্রাহ্মণ'—তরলিকা একটু হাসিল।

'ব্রাহ্মণ হ'লে কি হয়?'

তরলিকা আর একটা কিসের হাঁড়ি নামাইয়া আনিতে আনিতে কহিল, 'ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে মলে' স্বর্গে যায়—।'

অরুণ অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

'তুমি রাত্তিরে কি খাও? তোমার বাড়িতে আর কে আছে?—তোমার বিয়ে হয়নি—না?······ আচ্ছা অরুণ, তুমি মুখ নীচু করে থাকো কেন?—কই চাওতো আমার মুখের দিকে। আচ্ছা আমায় তোমার কি ভাবতে ইচ্ছে হয়?'

অরুণ আনমনে বলিল—'আমার এক দিদি ছিলো—কিন্তু তিনি আপনার মত এতো সুন্দর ছিলো না।'

'সে হোক ; তুমি তবে আমায় দিদি বলেই ডেকো। কি ভাব্‌চ ? তুমি এখান থেকে চেঁচিয়ে দিদি বলে' ডাকলেও তোমার বাবু কিছু শুনবে না ! ডাকো।' 'দিদি—!' তরলিকা আস্তে অরুণের চুলগুলি ফিরাইয়া দিয়া ডানহাতে কি একটা বিচিত্র খাবার পাতে দিতে লাগিল—

'সত্যি আর দেবেন না, আপনার পায়ে পড়ি।'

'না ভাই আমার, এইটি খাও—আজ—আচ্ছা আমি খাইয়ে দিচ্চি'—তরলিকা অপরিসীম স্নেহে একটার পর একটা খাবার ক্রমান্বয়ে অরুণের মুখে পুরিয়া দিতে লাগিল—শেষে মুখ ধোয়াইয়া, টাওয়েল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া পাশের সোফায় বসিতে বলিল—অরুণ দ্বিধাজড়িত চিত্তে বসিয়াই কহিল 'এখন উঠি—।' অরুণ ভড়কাইয়া গিয়াছিল। 'কেন লক্ষ্মী ভাইটী' তরলিকা অরুণের পাশে বসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিল—

অবহেলিত নোংরা ড্রাইভারের হাড়-ভাঙা খাটুনি, নানা রকমের করুণা, আর কৃপার মিশ্র রঙে, তাহার ভিতরে অসহ্য পুলকে রাঙাইয়া দিতে লাগিল। অরুণের শুষ্ক মুখখানি, লাল চোখ দুটি, বলিষ্ঠ বাহু দুখানা—সব তাহার চোখে কেমন একরকম হইয়া গেল।

'ইস্‌ এত জ্বর—এ যে জ্বর'—

···রাত্রি অনুমান দশটা···হরিহর বাবু এত রাত্রিতেও গৃহিণীর ঘর অন্ধকার দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে সুইচ টিপিতেই একরাশ আলো সমস্ত ঘরময় অধীর হইয়া হাসিয়া উঠিল। এককোণে সোফায় ও কে? কে শুইয়া আছ? পাশে একগাদা কম্বল, র‍্যাপার, বালিশ? —পলকে হরিহর বাবু রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখিলেন—তাহাদেরই ড্রাইভার আকাট ঘুমাইতেছে, আর তাহারই বুকের উপর মুখ রাখিয়া তরলিকাও জাগরিত নাই, তার এক হাতের পাখা অরুণের বুকের ওপর দিয়া ওধারে পড়িয়া আছে, আর তরলিকার সমস্ত মুখ অরুণের বুকের ওপরের অজস্র ঘামে একেবারে ভিজিয়া উঠিয়াছে। —হরিহর বাবু দন্তে দন্ত দংশন করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—একি এ, এ কি? এ কি! কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। একখানা মোটরের গভীর তীব্র হর্ণ শুধু দূর হইতে কানে বিঁধিল······

রচনাকাল।

বিদ্যানন্দকাটি, যশোর, ১৯৩৩।

প্রেম ও গৃহ

১৯০১ খৃষ্টাব্দ। বাংলাদেশের একটি মফঃস্বল সহরে একটা বালক একটি বালিকার দেহ মনের ওপরে আপন মনের রং ধরিয়ে দিতে লাগ্‌ল। বালিকার মনের এক-একটা পাঁপড়ি খোলে আর বালকের উৎসব সুরু হয়। রহস্যের অন্তরাল থেকে জীবন আসে উদ্ভিন্ন অবগুণ্ঠন ভেদ করে'—প্রতি সকাল, প্রতি সন্ধ্যা, বালিকার উপরে তার ডৌল এঁকে তোলে—অর্দ্ধস্ফুট দৃষ্টি, নির্জ্জন আহ্বান, উদ্বেল আকর্ষণ, ছন্দের পর ছন্দ দিয়ে তাকে রূপায়িত করে' তোলে। বালিকা তার ছোট হাতের কিল মেরে চমকিত করে, আবার চুমো দিয়ে হেসে ওঠে, ক্ষতিপূরণ করে, পালিয়ে যায়। উদ্দীপনার তাড়ায় বালক যায় পালিয়ে—বালিকা মূক হয়ে দেখে সেই শূন্য পদচিহ্ন। বালক ভাবে সে-ই তার স্রষ্টা, তারই মনের মাধুরীতে বালিকার সৌরভ-শীতল লাবণ্যের নিগূঢ় গতি-ভঙ্গিমা ;—চঞ্চল পদধ্বনি, তন্বী নমনীয়তা, উদার নয়নপট, বালক যেদিকে তাকায়, স্রষ্টার আনন্দ অনুভব করে, অন্তরের শিরা-উপশিরায় আরাম রোমাঞ্চিত হয়ে' উঠে।......

১৯১২ সাল। অন্ধকার বর্ষার আচ্ছন্ন আবেশ। পথ ঘাট জনবিরল। পল্লীর রন্ধ্রগুলো নীরব, অচল, আবিল। জনহীন নদীর বাঁধা ঘাটে ২৩ বছরের সেই বিনয় আর তার পাশে সেই —রেবা। রেবার বিশাল আয়ত চক্ষু ষোড়শ ঋতুর ক্রমদীপায়-

-মান কান্তিকে আশ্রয় করে কি খুঁজচে—অন্ধকারেও বিনয় তারই সন্ধান করচে। রেবার হাতটা গিয়ে পড়েচে বিনয়ের হাতে। এই সঁপে-দেওয়া কি সঁপে-দেওয়া? বিনয়ের মন ভরে' উঠ্‌ল—আকাঙ্ক্ষা হ'ল রেবার সৌরভকে সে দেদীপ্যমান করে' তুল্‌বে—সুরে, শক্তিতে, ঐশ্বর্য্যে। বাহিরে আছে বাহির, রক্তে আছে রক্তের ধর্ম্ম।—সকলের থেকে আলাদা হয়ে' বিনয় চল্‌ল রেবা-বৈচিত্রের তরণী ভাসিয়ে তার উর্ম্মি-বহুল জীবননদের আবর্ত্ত ভেদ করে'······রেবা জানেও না।······

বিনয় আর রেবার বিবাহ হ'ল। তৃতীয় কেউ তার সাক্ষী রইল না। সঙ্গের পর আসঙ্গ এল ঘন হয়ে'—বিনয় তবু বুঝলে না, রেবাকে তার পাওয়া হ'ল। চলে' গেল পেশোয়ারের এক পার্ব্বত্য অন্তরালে, কোন একটা অবলম্বন নিয়ে, ভাব্‌তে, সে কি পেয়েছে? বুঝ্‌তে, সে কি দিয়েচে? রেবা আছে পাটনায় পিতার কাছে। দুঃখ হয়, মন কেমন করে, তার বিনয়ের জন্য, তব ভাবে সে, বিনয় যেন তার কত কাছে। চক্ষু খুল্‌লে তার মনে হয় বিনয়ের অঙ্গুলি-সঙ্কেত; খুল্‌লে, আসে, হাওয়ায় ভেসে, না-বিনয়ের করুণ কান্না। বন্ধু অসীমা আদর কর্‌লে আসে সেই আদরের অবগাহ, পিতার শাসনে মনে লেগে থাকে কই সে-শাসন? রেবার সারাদিনের অন্তরে কাঁদে নিতল চাঞ্চল্য······

গঙ্গার ধার। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রেবা বল্‌লে বিনয়ের আরো কাছে এসে—"ভ্যাখো, আমি তোমার আছি।"

৭

মৃদু হেসে বিনয় বল্‌লে, "তাওকি জানিনা রিভু !"

মাথা আরও একটু হেলাইয়া উষ্ণ আবেশের আরও একটু হিল্লোল তুলে রেবা বল্‌লে, "কিন্তু সে-আমি কোন্-আমি ? তোমার রেবা তুমি নিয়ে গেছ দেশত্যাগী হয়ে' রক্তমাংসের রেবা তোমার কোন কাজে লাগ্‌লনা যে।"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস চেপে বিনয় বল্‌লে, "—রক্তমাংসের রেবাকে আর কারুর কাজে লাগাও, আমি নিজ হাতে সে বাসর সাজিয়ে দেব। আমার রেবা আমার থাক্।"

"কিছু করেই আমি তোমার যোগ্য হব তত যোগ্য আমি নই।"

—রেবা বল্‌লে বিমর্ষমলিন কণ্ঠে।

"রাগ করোনা, আমি তোমার মনের মতন সত্যিই নয়, হ'তে পারি না। যদি তা হ'তাম তোমায় দিয়ে আমি কত কি রচনা করতাম।"

বিনয়ের মাথাটা নুয়ে পড়্‌লো, বল্‌লে—"তোমার অহংকে আমি স্পর্শও কর্‌তে পারিনি রিভু, মনের মতন হলে' তোমার অহংকে দলন করেছি এই সার্টিফিকেট মিল্‌তো। দলনের পৌরুষ আমার নাইত। আমার অহং তোমার অপরিচিত, কি দিয়ে সে তোমার দৃষ্টিতে পড়্‌বে ?" একটু থেমে বল্‌লে, "কিন্তু তুমি এ অহংকে একদিন চিন্‌বে, টানবে,—এ আমি জানি,আমি ধসে' যাই নেমে যাই, একদিন তোমার ভিতর ভেদ করে জাগ্‌বে সে-ই-আমি, তুমি চিনতে পার্‌বে।"

……বাধা দিয়ে রেবা বল্‌লে, "তোমার উপলব্ধিই তোমার সত্য ; কিন্তু তোমার এ রূপ আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। ছায়ারেবা তোমার অন্তরে থাক্ ; কিন্তু তুমি বিয়ে কর, সে তোমার সুখ-সঙ্গিনী হোক।"

……মাথার চুল দুহাতে মোচড়াতে মোচড়াতে বিনয় বল্‌লে, রোমান্সের পর প্রহসন! ভালো। লোকের মুখ বদলাবে। আচ্ছা কর্‌ব। চলো—এই রিকসায় উঠি।

…বিনয়ের পত্নী দেখে রেবা ভাব্‌লে—একি? বিধাতা যে একে কোনো সম্পদ দেয়নি। এ ভিখারিণী সে কি করে' সইবে বিনয়ের পাশে! তার বিনয় একে নিয়ে হবে সুখী এ তার ভাব্‌তেও ঘৃণা আসে যে! বিনয়! এবিনয়কে সে ছাড়া আর কেউ দুর্ব্বল বলে' চিনবে—এ পরিচয় সে কি করে' বহন কর্‌বে? হাটের মধ্যে বিনয়ের হবে এ পরীক্ষা —বিনয় হাস্‌বে, আহ্লাদ করবে, পাত্নিব্রত্য দেখাবে! মনে মনে সে বিনয়ের সহস্র দুর্ব্বলতার অঙ্গে অঙ্গে আপন প্রেমের সম্পদ দিয়ে স্নান করিয়ে দিলে, ভাব্‌লে—এ বিনয় তার, চিরকাল তার, আর কারুর না।……

জ্যোৎস্নায় পৃথিবী হাস্‌চে। মধ্য রাত্রির. বন পাথার যেন আলোর আবেশে ঝিম্‌চে। অনেক দূর দিয়ে একখানা মেইল-ট্রেন এইমাত্র চলে' গেল সশব্দে একটা দুঃস্বপ্নের মত। ক্ষীণ আলোয় নিদ্রিত রেবার শয্যা স্বপ্নাতুর করে' তুলেছে। রেবার উদাস অবিন্যস্ততার এমন ছন্দ কার পাথেয় সোনায় পূরে' দেবে?

আলস ভরে তার বাহু এলিয়ে পড়েছে, কেশপাশ অবন্ধ, আলু-লায়িত, ইতস্তত মুখের ওপরে প্রবহমান। মুখে সচল সারল্য উজ্জ্বল তৃপ্তি ; ঘন সুষুপ্তির অনেক দূর দিয়ে যে তার অন্তর কি নিবিড় প্রাপ্তিতে মুগ্ধ শান্ত—সে বার্ত্তা কে জানিবে ? ঘড়ি টিক্ টিক্ কর্‌চে। একটা ওটিন স্নোর শিশির মুখ খোলা—ভাব্‌ছিল কখন প্রসাধন কর্‌বে, কিন্তু তা, আর ঘটেনি ; টেব্‌লের ওপরেই পড়ে' আছে। বিনয়কে একটা চিঠি লিখ্‌বে বলে' লেখার প্যাড্‌টা নিয়েছিল—বার তিনেক, "তুমি আর কাউকে ভাবলে আমার মন কিস্-কিস্ করে"—এই কথাটাই মাত্র লেখা হয়েচে।……

রাত্রির আয়ু আর নাই—। ছেঁড়া মেঘ জ্যোৎস্নার আলো পলে-পলে গ্রাস কর্‌চে। পাৎলা হাওয়া এদিক-ওদিক গাছে-বনে ছর্ ছর্ করে' উঠ্‌চে বেসুরো ভয় এনে ছন্দ ভেঙে। দু-তিন রকমের পাখী দূর মাঠে পালা করে ভোর রাগিনীর বেয়াড়া সুর সাধ্‌চে। অবসন্ন গোরুর গাড়ি কঁ্যাচর্-কঁ্যাচর্ ক'রে এগিয়ে আস্‌চে—আরও দূর থেকে। রেবা জেগে উঠেচে, হঠাৎ স্বপন দেখে ভাব্‌চে, সে স্বপন দেখে ভারী খুসী হয়েচে, বিনয়ের আবার বিবাহ, এর চেয়ে সুখের স্বপন আর কি হবে। রূপবতী গুণবতী সে মেয়ে। তারই সঙ্গে বিনয় হস্-হস্ করে উঠে যাচ্ছে সিমলার নিকটবর্ত্তী একটা মন্দিরের দিকে। তাদের কি আনন্দ ! কি তরল স্পর্দ্ধিত সুখ !

কিন্তু রেবার চোখে জল কেন? রেবার কি কর্‌লে ভাল হত? তারপর কি সত্যই আবার বিবাহ?

রচনাকাল

চুকনগর, খুলনা ১৯৩৭

জীবন না মৃত্যু না আরও কিছু

"……স্মৃতিপটের গহিন অন্তরালে আলোকপাত করে' দেখি—সেই-যে রমণী,সূর্য্যের চেয়েও যে সুমনোহর, যখন তাকে উঠিয়ে দেওয়া হ'ল, মৌনতা ভঙ্গ করে' যেন বলে' উঠলো, 'আমার জন্য কাঁদ্‌বেনা, দিন আমার অক্ষয় হ'ল—অমরলোকে আঁখি আমার চিরতরে খুল্‌ল……"

……আগ্রায় এসে রবিকর পৌঁছাল - চার পাশে তার আরও অনেক লোক—'এরা নিয়ে চলেছে সেদিন মৃন্ময় দিব্য প্রতিমাকে সলিল-বিসর্জ্জনে। ব্যর্থ দিনের সন্ধ্যা-নির্ব্বাণ শত সাধের রক্ত-শতদল মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে খুল্‌চে! অনেক বড় সে আলেখ্য ঘিরে অনেক বড় প্রেম নিবিড় হয়ে' উঠ্‌ল। এই প্রেম সে তার, লায়লীর সঙ্গে এক করে' ভাব্‌লে, মরজগতের অমর খ্যাতি দিয়ে সে তা'কে বরণ কর্‌লে। সেইদিন পথচারী ভদ্র-সম্প্রদায়ের' দিকে তাকাতে তাকাতে মাঠে পা দিয়েই রবিকরের মনে হ'ল যেন কি, চোখ পড়্‌ল মীরার দিকে—মীরা রায়সাহেবের কন্যা, স্বামী তার আই, সি, এস, অতি সাধারণ, অথচ অযোগ্য নয়, চেহারাটা পরবর্ত্তী মনতরঙ্গে তার মিলিয়ে গেছে।

"তাজমহলের প্রবেশ দ্বার—কঠিন মর্ম্মর স্মৃতির ভঙ্গুর উপহাস আর ব্যর্থ পরিপূর্ণতা; দূরে কালিন্দীর উজানবাহী প্রণয়-ঐতিহ্য

আর জীবনের প্রলয়-পরাকাষ্ঠা, সেই রমণীর সঙ্গে হ'ল সেই-প্রভাতে চোখোচোখি—শুভদৃষ্টি—"

······এ মধুমাস রবিকরের ত্রয়োবিংশ দান আর মীরার জীবনে নেমেচে বিংশতির ঢেউ—। রবিকরের মুখে আছে যৌবনের সব সৌন্দর্য্যেরই সাক্ষ্য। তবে···"সেই রমণীর যদি কিছু বল্‌তে হয় তবে বলো, 'স্বর্গীয়'—সেই ভাব-ডগমগ পক্ক-নধর হৃদয়, সেই শোণিত-চঞ্চল মহীয়ানতা, আর উৎকীর্ণ লাবণ্য-লালিমা! পথ চলে, তার কালো আঁখিপাতা থাকে নুয়ে, আব্‌লুসের মতো কালো তা'—যখন আঁখি তুলে সে চায় তার দৃষ্টি থেকে নামে প্রভাত সূর্য্যের প্রথম বিস্ময়—পুরুষ যেন স্তব্ধ হয়ে' থাকে চেয়ে, বুকে লাগে বিদীর্ণ স্মৃতির অরক্ষিত উদ্বেলতা, অর্দ্ধ-জ্ঞাত আবেগের বেগবতী আলেখ্য-সঞ্চরিণীর স্তরপর্য্যায় আর রোমাঞ্চতা, জীবরাজ্যের কর্দ্দম-কোলাহলের নীল সুধা। ধ্যান নামে অনাদিকালের তরে, থরে থরে আকাশে পড়ে ঢলে'······"

এম্‌নি করে' সেই ব্যাপারের উল্লেখ করে রবিকর একবার নয়, একবারেরও অনেক বেশি, অনেকবার। মুখে জাগে তার "নিষ্প্রভ আনন্দ জীবনলোকের শিহরণ-সীমান্তে।"

"আচ্ছন্ন দিন, বর্ষা সজল। এম্‌নি দিন সেখানে বসন্ত কালে মোটেই দুর্ল্লভ নয়। এম্‌নি সময়ের এ ঘটনা যে সে সময়কে বলা চলে—'প্রাচীন'—'পৌরাণিক' অর্থাৎ যে-কালের সবই মধুর স্বপ্ন-বিজড়িত, বসন্তের বিপ্লবী বাতাস সমস্ত প্রাচীন শিলানগরীকে দিয়েছে দোল—শীর্ণ বিন্দুর দল বর্ষার আড়ালে চক্‌-চক্‌ করচে।

সেই প্রাচীর, সেই স্মরণ-কবর, গম্বুজ, জনমণ্ডলী, যারা বাসা বেঁধেচে এইখানে, তাছাড়া তাদের জীবন, সমগ্র জীবনে তাদের ভাব, তাদের বিশালায়তন কর্ম্মকাণ্ড, সকলের উপরে জ্বল্‌চে সেই উজ্জ্বলস্ফটিক কোটি কোটি বারিবিন্দু দল······”

এম্‌নি করে' দেখে রবিকর আপন দিন; আর দেখে অসত্য সত্যের বুকে সত্য স্বপ্ন। তার প্রিয়গ্রন্থ মেঘদূতের পাতায় কি সে খোঁজে, সারাক্ষণ থাকে তা' তার শয্যাশিয়রে, এইখানেই লেখে সে তার বার্দ্ধক্যের দিনে ঃ—

······“মীরার গুণেই মীরার শুভ্র খ্যাতি, আমার উৎসবেই সে উৎসারিত। উদিত হ'ল আমার যৌবন-বেলার নয়ন-সীমান্তে। কিন্তু সেই আবার সেই অন্ধকারে নিভে গেল এ প্রদীপ জীবনের। হায়রে, সেই কথা! অদৃষ্টের সেই লুকানো কথা আমার জ্ঞানে রইল না তো! রাজগীর পৌঁছবার পূর্ব্ব-দিন অবধি এ নিদারুণ কথা আমি জানিনি, মে মাসের উনিশ দিন চলে গেছে। তার নয়ন-হর অমলিন তনু পৃথিবীর গর্ভে চিতার মুখে তুলে দেওয়া হ'ল—তার ভ্রাতাদের সে ভস্ম-শেষ, দাহক্ষেত্র, তার মৃত্যুদিনের দিনশেষে জীবনপথের মৃত্যু-পান্থশালায়······”

“তার আত্মা, আমার ধারণা স্বর্গে এলো ফিরে, সেই যে তার পরম বিরাম, চরম নির্ব্বাণ। এই ক্ষণের স্মৃতি কিসে হবে তা চির জাগরিত, চির তন্দ্রাহীন! যে-গ্রন্থ আমার দিবানিশি কাছে থাকে তারই পাতায় এ কথা লিপিবদ্ধ কর্‌তে আমার আসে এক তিক্ত আরামের অনুভূতি। এই দুঃখের জ্ঞান আমার অন্তর ভরে'

থাক্‌বে এ যে আবশ্যকই বটে—আজ থেকে আর কিছু থাক্‌বে না, আর কেউ থাক্‌বে না, সান্ত্বনার—এ পৃথিবীর নীড়-ছেঁড়া মৃত্তিকা আমার যে আজ ত্যাগ কর্‌বার দিন !

এ-যে ঈশ্বরের দান আমার, এ আমার দুঃখের হবেনা। আমি জানি আমার ক্ষণস্থায়ী দুর্ভাবনার স্তূপ বৃথা আশার বড়বাবর্ত্ত আর অগ্রোৎক্ষিপ্ত জীবনের কষ্টের ঢেউ আরো ঢেউ……”

লেখা হ'ল।

তার জীবনে সে ছিল বলবান্ কৌশলী ; তার মাথা ক্ষুদ্রাকৃতি,—গোল, দৃঢ়নির্ম্মিত, নাসা মধ্যমাকার আবেগে উৎকীর্ণ, মুখের গোলটা কোমল, বৈকল্য হীন গালে আছে রক্তাভার শান্তি আর স্বাস্থ্য ; চোখের রঙ বাদামী ; দৃষ্টি শানিত, ব্যগ্র। আর মীরার ?

“……তার বিশেষ প্রতিভা, জ্ঞান আর গতি, ছন্দ আর ছায়া, অনুপম দ্যুতি আর দম—এতেই সে প্রখ্যাত হয়ে' উঠেচে—এই অপরিমেয় ঔজ্জ্বল্যে সে ওতপ্রোত, তার নাম তাতে অমর।……

“তবু তার বয়সের যে কাজ, তাতেই সে থাকে জড়িয়ে জড়িয়ে। প্রকৃতির সব সুন্দরের সৃষ্টি-স্তরে লাগে তার প্রতিভার প্রেরণা। সমাজের, তার সমচারীর যে সমাচার তাতে তার খুব প্রসিদ্ধি—সকলের সঙ্গে তার সেই মেশা, সকলকে নিয়ে তার আকর্ষণ, ভাব, বাগ্মীতা, আর তার কথোপকথনের ভাষা !

“স্মৃতির পটে তার পরিপক্ক দিনের মূর্ত্ত ভাষা—শুচিতা-পদ্ম-কাননের প্রভাময় আশ্রমগৃহের সর্ব্বোত্তম প্রাণ বলে' সে শির

শোভিত হয়। এ গঠন-কারু সমস্ত উচ্ছ্বসিত সম্পদ-প্রাচুর্য্যে অধীর হয়ে' ওঠে চৈতন্য শক্তির রেণুতে রেণুতে।"

তাই সে লিখ্‌লে :—

"আর কিছু ভাবিনা, কেবল সে ছাড়া—মিলন-দিন সে আর ক্রুত করবে না! ঐ আস্‌চে এগিয়ে, আস্‌চে, আমায় ডাক্‌চে—......"

এরপর সে বন্ধুকে লিখ্‌তে গিয়ে লিখ্‌লে :—

"সাধ হয় বই নিয়ে আছি, হাতে রয়েচে লেখনী,—অথবা আরও ভালো, চোখ আছে জলে ভরে', প্রর্থনায় আছি ডুবে। সুখে থাক্। সাহস থাক্ সাধুবৃত্তি থাক যেমন মানুষের থাকে।"

এ চিঠির আরও কিছু পরে জুন মাসের চতুর্থ দিনে সে আছে কাজ নিয়ে। হটাৎ মাথাটা তার পড়্‌ল ঝুঁকে সাম্‌নের দিকে নুয়ে পড়্‌ল দেহ স্খলিত হ'য়ে লেখার ওপর।......মৃত্যু তার আশা পূর্ণ কর্‌লে।

এতেই—'পার্থিব আর অপার্থিবের পরম সমীকরণ'

যেদিন তাদের দেখা, প্রথম দেখা, সেদিনটা রমণীর ভাগ্যের ছিলো শুভদিন।

"......কোমল তার হৃদয়, আবেগ নমনীয়; তবু, তবু অর্দ্রাঢ্যের লেশ নাই সেখানে—কর্ত্তব্য, মর্য্যাদাবোধ, ঈশ্বরনির্ভরতা, আর তাঁরই নির্নীত সূত্রমালা ভাসে তার চোখে আর ধ্বনিত হয় তার সারা জীবনের ক্ষণগুলি ভরে'।"

বিশ বছর ধরে' মীরার পার্থিব মূর্ত্তির উৎসব—তাই নিয়ে সে কাল কাটালে ; আর এক চতুর্থ শতাব্দ—রইল তার শ্মশান-পারের এ অস্তিত্ব। সে গণনা কর্‌লে তার সারাজীবনের মধ্যে, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে, মাত্র এক বছর, বা তারও কিছু কম সময়, তাকে দেখেচে। প্রত্যেক বারই সে দেখা তার অনেক লোকের মধ্যখানে, আর সব সময়ই 'এক গৌরমশ্রি কৃত্রিম অনুভাবের কুণ্ঠিত অন্ধকারে।'

"……সেদিন সে আভা—পাণ্ডুর হয়ে' উঠ্‌ল। এটা ঘটল বিদায় বেলার সন্ধিক্ষণে। মুখ এলো নেমে দিব্য বিভার শান্ত শীতলতায়, মনে হ'ল নীরবতা যেন আজ শব্দায়মান হ'ল : কেন আমি তবে হারাব আমায় এম্‌নি করে' !……"

সাধারণ নরনারীর সত্য সুখ দুঃখ আর স্পষ্ট অভিজ্ঞতা তার হয়েচে। নারীর প্রেমে সে বঞ্চিত নয়। সে প্রেম বিনশ্বর, সহজ, অপরের বাধা হয়ে' তা' ওঠেনি—তার দুটি ছেলেও ছিল বটে। আর মীরা ? তারও ছেলে আছে, বিশ্বাসঘাতিনী সে নয়, পতিতার বৃত্তি সে করেনা—এ-ও যোগ্য সহধর্ম্মিনীই বটে।

"……কিন্তু সারাজীবন ধরে' প্রতীক্ষা কর্‌চে এ রমণীর আত্মা সারা মরণের পরপার—সেই প্রেম ! অপরের প্রতি তার সেই প্রেম ! গ্লানিহীন, জ্বালাহীন !……"

১৯—সনের সামান্য কয়েক সপ্তাহ ধরে' দুচারটে প্লেগ—তারই মধ্যে এ রমণীর জীবন লীলা সাঙ্গ হ'ল……

"……সে-সন্ধ্যায় আলোক-প্লাবিত সুসজ্জিত কক্ষে তার

শোকার্থীর দল। আত্মীয়ের হয়ে' তারা তার আত্মাকে দিচ্চে চোখের জলের শিল্প! ঢিলে তাদের পোষাক, সুমনোরম তাদের আকার, এইখানেই একদিন মীরা তাদের আনন্দ বর্দ্ধন করত—। কঠিন সে ছোঁয়াচ পরিত্যাগ করে' অপরের প্রেমে আজ তার মুক্তি ভুবন ভরিয়ে দিয়েচে। জীবনের পর্ণপুট ভেঙে জন্ম পেয়েচে মৃত্যুর নৈবেদ্য……"

"……অশুভ দিনের পরের রাত। জীবনের ধ্রুবতারা হ'ল অধ্রুব, না……নতুন করে' হ'ল দীপায়িত স্বর্গরাজ্যে, থেমে গেল মেরু-নিশীথিনীর মলিন আগুন, শীতল আর্ত্ততা। পার্থিব স্পষ্ট-তারই মত প্রাচ্যের মণিমাণিক্যভূষিত সে স্বপ্ন-সূর্য্যের নিঃশঙ্ক উদয়। বহু আকাঙ্খিত সেই বাহু এল আমার বাহু-লগ্ন হয়ে', বল্‌লে, 'জানো তুমি তাকে···তোমার পথের থেকে চিরদিন যে সরে' এসেচে, প্রত্যেক সাক্ষাতের আড়াল দিয়ে দিয়ে! জানো, মৃত্যু তাদেরই ভয়, যাদের সমস্ত সুখ এই হতভাগা পৃথিবীতেই খুঁজ্‌তে হয়।……"

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে শীলভদ্রের লেখা একটা পুঁথি আছে; আলমোড়ার উপত্যকা অঞ্চলের একটা চিত্র তার আরম্ভে উঠেচে ফুটে; খাড়াই তুলেচে মাথা, নিবিড় মেঘাবরণ শ্যাম অর্দ্ধশ্যাম বিরল অতিবিরল গুচ্ছ গুল্ম আর ধূম-সবুজের স্তূপ। —সেই বিবরণের ঠিক নিচে রবিকর লিখেচে: আমার পরা-পার্ব্বতীয় একাকীত্ব।'

"……আজ মীরা কোথায়? এই পুরাতন নীরস ধূলিধ্বস্ত

আগ্রানগরীর কোন্‌খানে ? আগ্রাহোটেলের......? পূর্ব্বদিনের বিদ্রোহ-ক্ষেত্রের কোনো......? ঐ যে স্মৃতি স্তম্ভ! কার ওটা? মমতাজের ? নাগরাজের ভারী রথের পথের পাশে পড়ে' আছে ঐ যে মহল—একদিন হুকুম এলো ঐ মহল ভেঙে খুঁড়ে তোলা হোক মমতাজের তনু দেহের চূর্ণ-অস্থি আর চিহ্নলেশহীন পেলবতা। তাজমহল গেল, তার শোণিত সঞ্চালন যা নিয়ে দম্ভভরে দাঁড়াল সে মমতাজ গেল কোথায় ?......যায় নাই—ফুরায় নাই—আছে স্বর্গরাজ্যের সম্পদ তা নইলে কিসে হবে পরিপূর্ণ ?......

লাবণ্যের হাসিবার একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল। যেমন ভাবে তখন চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, যেমন করিয়া তার গালে টোল্ খাইত, ঠোঁটে চমক খেলিত, ললাট রাঙা হইত—সেটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট। সে আর কারুর অনুকরণের যো ছিল না।

······নারীর রূপের আসলটা কি, আর কি দেখায়, এই লইয়া তর্ক চলে না; তবে পড়তা বুঝে সমবায়-সাধনে সক্ষম হইলে ফল আছে। স্বাস্থ্য রূপের শক্তি—স্বাস্থ্যহীন রূপের দৈন্য মুখ আর হাত দুখানায় প্রথম ধরা পড়ে—দেখানোর বেলায় এই মুখ আর হাত দুখানাই প্রথম শুধু নয়, প্রধান। কিন্তু স্বাস্থ্যের পরেই আসে রমণীয়তা। স্বাস্থ্য থাকিয়াও রমণীয় না হইতে পারে। কতকগুলো অবিশ্যি আছে নৈমিত্তিক কারণ, যেমন অনিদ্রার ফলে চোখের সৌষ্ঠব নষ্ট হয়, চামড়ার সত্যকারের শোভা অর্থে চাই তাকে সত্যিই ময়লামুক্ত করা—নিছক রঞ্জনদ্রব্য আর সাবান প্রসাধনে তা হয় না। ধরা যাক্ সর্ব্ব প্রকারের প্রয়াস লইয়াই স্বাস্থ্যকে সুন্দর স্বাস্থ্যে প্রকাশ করা হইল। কিন্তু তা' হইলেও রমণীয়তা আসিবে এমন না-ও হইতে পারে। দেহাবয়বের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট থাকে প্রত্যেক দেহের—সেই ছন্দটা যে ধরিতে পারে রমণীয়তার সূত্র পায় সে। প্রত্যেক কবিতার যেমন একটা

বিশেষ ছন্দ আছে, প্রত্যেক রমণীয়তারও তেম্নি বিশেষ একটা সাজ আছে। এই সাজটি বহিরাবরণ হইলেও এ বিজ্ঞানটি খুব ভাবিয়া আয়ত্ব করিবার প্রয়োজন। বস্ত্র, বর্ণ, অন্যান্য পোষাক কথা বলার ভঙ্গি, অন্যান্য অঙ্গভঙ্গি—সবকে সেই তানে বাঁধিতে পারিলে এটি সাধ্যের বাহিরে থাকে না কোনো মেয়েরই।······

অধিকাংশের একটা ঔদাস্য আছে ; তলাইয়া বুঝাইবার লোক থাকিলেও তলাইয়া বুঝিতে কমই চায়। লাবণ্য এইখানে একেবারে অত্যন্ত স্পষ্ট হইতে চায়, প্রখর হইতে আশা রাখে—। সে তার সম্পর্কে অত্যন্ত চেতন। ফাঁকি দিয়া বাজিমাৎ করিতে তার একটা অকপট ঘৃণা ছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং রমণীয়তা বিধানের জন্য সে আহার নিদ্রা পাঠ প্রত্যেক দিক হইতে সতর্ক ছিল। নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সে চাহিত না, সখীরা ব্যায়াম করিতে দেখিলে টিপ্পনি কাটিত, সে তা-ও গায়ে মাখিতনা। সর্ব্বসমন্বয় সুস্থ দেহ আর সুস্থ মন এই তার সাধনা ছিল।······

এই সুচিন্তিত সমবায়ের অদ্ভুত অমৃতফল লাবণ্যর হাসি। এ হাসির অনেক দিক। এ হাসি সৃষ্টির অনেক উপকার করিত অনেক অপকার করিত। কেবলই হেদুয়ার জলে সাঁতার কাটিয়া বাড়ি ফিরিলে তাহার দাদার বন্ধু তাকে বলিয়াছিল—'কি চমৎকার!'—লাবণ্য হাসিয়াছিল, বন্ধুর মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল তাতে। একটা ভীষণ মোটর দুর্ঘটনার হাত হইতে অতি অকথিত ধরণের নৈপুণ্যের সহিত একটা বিশাল-কায় নেপালী তাহাকে মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়াছিল, সেদিনও তেম্নি

হাসিয়াছিল, নেপালীর সতেজ চক্ষু তাহাতে বোকার মত প্রতিভাত হইতেছিল। যেদিন ইংরেজী শিক্ষক তাহার কোনো একটা রুক্ষ প্রতিবাদে 'অশোভন' বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল—শিক্ষক মহাশয় আরো ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। দেশ-কর্ম্মীর দলে নাম লেখাইয়া নরেন আসিল তাহার কাছে বিদায় লইতে—তার সেই উচ্ছলিত উৎসাহের মুখের ওপরে লাবণ্যের হাসি ঠিক্‌রাইয়া পড়িল—নরেন বুঝিল বালিকা তুষ্ট করিল মাত্র, তার প্রোৎসাহিত ত্যাগের সে স্বাদ ভুলিল।......

বিজয়ী রণবীরের মত সহাস্য-আয়ুধ লাবণ্য এম্‌নি কত অঘটন-ঘটনে সমর্থ হইল কে জানে?......

লাবণ্যের বয়স বাইশ। সে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী, সামান্য দিনেই সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হইবে। তার ভরা যৌবন, অটুট স্বাস্থ্যে আত্যন্ত পক্ক-পেলব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হাসির তীর আর ক্ষণিকের তূণ—এ তার যেন আর ভালো লাগে না। আচম্‌কা বিবাহ সে করিবেনা ইহাই ছিল তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ভালোবাসিয়া সে বিবাহ করিবে এমনও সে ভাবে নাই। কি জানি কেন প্রত্যেক পুরুষকেই তার কেমন যেন সস্তা আর তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। টাকা আর শিক্ষা আর রূপ—এই তিন জিনিসের সংযোজনেই ভালো বর এ ভাবিতে তার বিশ্রী ঠেকে। সে ভাবে বিবাহ সে করিবেনা। কি হয় বিবাহ না করিলে?

······কিন্তু দিন যায়, জীবন তার হুকুম তামিল করিতে ছোটে। লাবণ্যর হাসি তার তীব্রতা হারায়, নির্লিপ্ততা ভোলে। লাবণ্য বোঝেও না। সে তার আগের মত খুসীতে হাসিতে পারে না, সে তখনই হাসে যখন সে সত্যিই আশা করে, আনন্দ পায়।······

এম্‌নি সময়ের একটা ঘটনা।

লাবণ্য চুপ করিয়া আপন ঘরে বসিয়া আছে এমন সময় তার ছোট ভাই অখিল আসিয়া দিল হানা। কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল দিদির মুখের দিকে তাকাইয়া :—

"তোমার কি হয়েছে দিদি ?"

লাবণ্য মৃদু হাসিয়া বলিল, "তার মানে ? মর্‌তে বসেচি নাকি ?"

"ভ্যেৎ—কি বল্‌চে !······আমায় এই কবিতা বুঝিয়ে দেবে ?"

"কই দেখি······এখন থাক্ রে ; পরে বুঝিয়ে দেব। আচ্ছা, রাত্রে খাবার পরে। কেমন ?"

"বেশ, তা'হলে' এখন যাই। তুমি কি পড়্‌চ ?"

"অ্যাঁঃ······" অখিলের ভালো লাগিলনা, সে চলিয়া গেল।

লাবণ্য ভাবিতেছে—"দুর্ ছাই, প্রেমে পড়িলাম নাকি ?"

সে তাড়াতাড়ি বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল—কিন্তু আবার তার মনে হইল, 'কি দেখিয়া এত ভাবিতেছি ?' কিন্তু ইচ্ছারও বিরুদ্ধে তার মনে উঠিল নিরুপম চরিত্র।

......কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ নিরুপম চরিত্রের। তার চাউনি, তার কথাবলার ভঙ্গি, তার সব! বিশ্বের জ্ঞান যেন তার করায়ত্ত—তবু তার কী অবহেলার বিবৃতি—জ্ঞান যেন গরিয়সী নয়, জ্ঞানী যেন শ্রদ্ধার নয়! কি অদ্ভুত তার ঔদাস্য, জগতের কিছুকেই বুঝি তার প্রয়োজন নাই, জগতের সবই যেন কাণাকড়ির বেসাতি। লাবণ্যের এই রূপ, এই হাঁসি, এর কিছুই যেন তাহাকে মুগ্ধ করেনা; মুগ্ধ-হওয়া মনটা যেন তার নাই, অথচ উপহাস, ঘৃণা তা-ও তার কই? সে কি? আশা? আকাঙ্ক্ষা? কিছু কি তার নাই? লাবণ্য যতই ভাবে, আশ্চর্য্য হয়, তার ইচ্ছা হয় সে যা-কিছু করিয়া হোক্ প্রমাণ করে সে এত অবহেলার নয়।

একদিনের কথা তার মনে পড়িল। লাবণ্যর বন্ধু বেলার কথা হইতেছিল।

নিরুপম বলিল—"ও, সেই মেয়েটীতো—! তিনি বুঝি আপনার বন্ধু?"

গম্ভীরভাবে লাবণ্য বলিল, "হ্যাঁ; কিন্তু আপনি তাকে 'শ্রীমতি' বলে' সম্বোধন করলেন কেন?"

"কি বল্‌তে হ'ত? মিসেস্? না, দেবী?......কিন্তু মেয়েটি এমন করে' তাকান! আর ভাবেন, খুব আকৃষ্ট কর্‌চি—বাস্তবিক বড় করুণ, নয়?"

"আপনি আমার বন্ধুকে অবজ্ঞা কর্‌তে পারেন না।"

"না, না, অবজ্ঞা কর্‌ব কেন?"

সে স্বরও লাবণ্যের মনে হয় কৃত্রিম।

কি ধরণের কথা নিরুপমের ভালো লাগিতে পারে লাবণ্য তা বহু ভাবিয়াছে। কিন্তু ব ঝিতে পারে নাই।

লাবণ্য একদিন তার রায় সাহেব মামার কথা বলিতেছিল যথেষ্ট সংযত ভাবে এবং ধীরে—

"বাস্তবিক ওঁর এই-যে আত্মনির্ভরতা এ আমার ভালো লাগে।"

নিরুপম বল্‌লে,—"তার চেয়েও ভালো লাগে আপনার মুখে তার বিবৃতি।"

লাবণ্য ভাব্‌লে—কিছুই ভালো লাগেনা নিরুপমের, সব দেখেই যেন সে আমোদ পায়।

……দিনের পর দিন লাবণ্য আশ্চর্য্য হয়, যতই ভাবে আরও আশ্চর্য্য হয়। তার ইচ্ছা হয় যা কিছু হোক্‌, করিয়া সে জানাইবে লাবণ্যকে দেখিয়া আমোদ পাইবার মত নয়।

সে আছে, আছে, আছে বিশেষরূপে, বিশেষ ভাবে, বিশেষের জন্য আছে। তাহার কল্পনা ধ্যান সব যেন একাকার হইয়া ওঠে নিরুপম। ইচ্ছা হয় ঐ আঙুলগুলো সে একটু চাপিয়া ধরে, দুটি বাহুতে দুটি বাহু ঢালিয়া দেয়, একটু দুচোখ দিয়া প্রমাণ করে অন্তরের রস।

……লাবণ্যদের মাণিকগঞ্জের বাড়ি। লাবণ্য আর নিরুপম দুজনে বসিয়া আছে একটা ঘরে—নিরুপম নিরবে একটা ছবি দেখিতেছিল অখিলের সঙ্গে একসঙ্গে—লাবণ্যও কিছু করিতেছিল

আপন মনে। হঠাৎ একটা সাপ তক্তপোষের পাশ থেকে ফণা মেলিয়া ফোঁস্-ফোঁস্ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। লাবণ্য 'উঁ' বলিয়া ছুটিয়া আসিল আর এক কোণে, অখিল কোনোরকমে বাহির হইল কিন্তু……

"দাঁড়ান" বলিয়া নিরুপম মুহূর্তে লাবণ্যকে মৃদু ধাক্কায় পিছাইয়া দিয়া সাপের সাম্‌নে আসিল এবং তার সুবিস্তৃত এক-হাত-দীর্ঘ ফণাটার উপরে এক নিদারুণ চপেটাঘাত করিল—পর মুহূর্তে একটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক লইয়া বিদ্যুৎবেগে সেটা তার ঘাড়ে চাপাইল—। এক লহমার পর নিরুপম বলিল, "কি চমৎকার ন্যাজটা নড়াচ্চে! বাঁচ্‌বার এখনো ইচ্ছে!"

একটা স্তম্ভিত বিস্ময় তখনও যেন অবশ হইয়া উঠিতেছে সারা ঘরে। এই সহজ মন্তব্য আর উদ্দীপনাহীন সাহস নারী-হৃদয় চম্‌কাইয়া দিয়া যাইবে, কে-না জানে? লাবণ্যের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি তখনো সহজ নয়। সে প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আপনি কি!"

নিরুপম তার চিরাচরিত অবহেলার সহিত বলিল,—

"হয়তো হারকিউলিস্, নয়তো ভীম, কি বলেন?"

……লাবণ্যের স্মৃতিতে আসিল সেই স্পর্শ নিরুপমের—সেই অবহেলা আর আশ্রয়দান, রক্ষা। তার অন্তর উদাস হইয়া গেল।

……পরের ঘটনাটুকু গতানুগতিক। কিছুদিন পরে ইহাদের বিবাহ হইল। বাধা কিছু ছিল সে বিবাহে। কিন্তু আলোক-

প্রাপ্ত এই দুই নরনারীর পক্ষে সে বাধা, আরো আকর্ষণের আরো মধুর হইয়া উঠিল।

······ছায়াছবির পট পরিবর্ত্তনের মত লাবণ্য একদিন দেখিল সে একরাশ সজ্জিত স্ফুটিত-শোভা, আর নিরুপম সে শোভার সমস্ত আশ্চর্য্য-ভাণ্ডটার সমূল মধু হরণে উত্তেজিত, উদ্বেল। সমস্ত-দিনের কার্য্য-ক্রমের ভিতরে নিরুপম হারাইয়া থাকে—সান্ধ্য হাওয়া বহিতে সুরু হইলেই নিরুপমের বিশ্রামের ঘণ্টা বাজে। সে তারই মধ্যে বন্ধুকে আপ্যায়িত করে, আত্মীয়কে মিষ্টি কথা বলে, সকলের দাবী মেটায়—তারও পরে ক্লান্ত দেহে শুষ্ক মনে সে আসে লাবণ্যর কাছে। আদর করে আমোদ দেয়, এটা-ওটা-সেটা লইয়া সময়কে কাটায় আর সার্থক করে—বাজে উদ্যোগে, বাজে আলাপে আর বাজে অভীষ্টসিদ্ধিতে—গূঢ়তা, গাম্ভীর্য্য সেখানে এতটুকু আসেনা—এতটুকু নষ্ট করে না।

লাবণ্যর মনে হয়,

সে কি চাহিয়াছিল? নিরুপমকে দেখিয়া তার কি আশা আসিয়াছিল? কি সে পাইলনা? সঙ্গ? সঙ্গকে অক্ষয় করিয়া পাইবার মত কি তার আছে? কি সে হারাইল? সম্মুখেই বা কি? 'আশ্চর্য্য'ই বা আর কতদিন?

অকারণে কান্না তাহার বুক ছাপিয়া আসিল, চক্ষুর পাতা দুইটা বার বার তাহাতে ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

নিরুপম এম্‌নি সময় ঘরে ঢুকিল।

"লাবণ্য, কাঁদচ? ছিঃ এই তো আমি এসেচি। আজ আমার আর যাওয়া হ'ল না।"

লাবণ্য আরও কাঁদিতে লাগিল।

বিদ্যানন্দকাটি,
যশোহর, মে ১৯৩৩

এক-বৃন্তের

"......তাই না ছোড়্‌দি—ই ?"

ছোড়্‌দি বারো উদাহরণের অঙ্ক কষিতেছিল, মাথা না তুলিয়াই বলিল, "হুঁ।"

"......ছোড়্‌দা বলে সুয়েজ কেটে খাল না কর্‌লে......

আচ্ছা বল্‌তো তিন মহাদেশের মধ্যে এ খাল কাটবার বুদ্ধি কার মাথা দিয়ে এলো ?" অনল একমনে ঘুড়ির ন্যাজ জুড়িতেছিল, সাড়া না পাইয়া বলিল, "তুই তার নাম ছাই জানিস। আচ্ছা, ছোড়দা যে বলে এস্কিমোরা মোমবাতি চিবোয়......" "বল্‌তো অনু, ছোড়্‌দা এখন কি কর্‌চে ?"—রেখু বল্‌লে। টানিয়া টানিয়া অনল সুরু করিল—"দশটা বাজ্‌লো তো। ৩২ নম্বর গুরু প্রসাদ চৌধুরীর বাসা থেকে বা'র হয়ে'—বলাই সিংহী লেনে পড়ে'—বেচু চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীটে উঠে'—ঐ তো সিটি কলেজ—কে জানেনা, ভারী শেখাচ্চে, আচ্ছা সিটি কলেজে তুই কবে পড়্‌বি ছোড়্‌দি !......"

ঐকিক নিয়মের অঙ্ক বড় কঠিন—প্রশ্নোত্তরমালার উত্তর মিলিতেই চায় না—বারোটা লোক সাত দিনে কর্‌লে......

"যাচ্ছে তাই। হাঁটুভাঙ্গা মাষ্টারণী যা-তা বল্‌বে।"

—রেখু অনলের কথা শুনিতে পাইল না। অনল ভ্রূক্ষেপ

না করিয়া সবুজ কাগজের ফালিতে আটা ঘসিতেছে আর গান করিতেছে গুণ্ গুণ্ করিয়া—

"সাথী—হারা, কাটে বেলা।"

অঙ্কের উত্তর না মিলিয়া রেখুর রাগ হইতেছে, বাঁহাতে মাথাটা একটু চুলকাইয়া লইয়া পট্ করিয়া মুখ তুলিয়া, একটু হাসিয়া রেখু বলিল, "তোর সাথী হারাল কখন অনু ?" অনুর গালে চুমু দিল। চুক্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে রেখুর চুলের মুঠি অনু সবলে টানিয়া ধরিল। "ছাড়্, ছাড়্ অনু, আমি দিলাম চুমু, আর তার বদ্‌লি······আচ্ছা······উঃ লাগে যে—"

"আমি বুঝি বড় হইনি, না ? আমায় চুমো ! আমি বুঝি শুক্‌লির মত আছি, না ?"

"অনু, লাগ্‌চে কিন্তু, ছ্যাখো মা, অনু আমার চুল ধরেচে কেমন করে'।"

অনু চুল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "সব তাতেই ছ্যাখো মা-আ-আ······'মেনি বিড়াল টুক্-টুক্, দুধ খায় চুক্-চুক,'—খাবি ? ······আয়না ছোড়্‌দি ছোরা খেলি, আমার সঙ্গে পারবি ?" ঘুড়িটা টেব্‌লের দিকে ঠেলিয়া দিয়া অনল হাত দিয়া প্যাঁচ্ দেখাইতে লাগিল—"তামেচা, বাহেরা—" থুঁতু দোলাইয়া বড় চোখে রেখু তাকাইল—"আমায় অঙ্ক কর্‌তে দিবিনা অনু ?"

অনু এইবার রেখুর হাত হইতে পেন্সিলটা ছিনাইয়া লইল, পর মুহূর্ত্তে তাহার দুই গালে দুই হাত দিয়া মুখের দিকে মুখ

ফিরাইয়া বলিল, "ছাখ্ ভাই ছোড়্দি, চল্না গাঙের ধারে ঘুড়ি ওড়াই—।"

ব্লটিং-কাগজ খাতায় চাপা দিয়া থপ্-থপ্ করিয়া ঘা দিতে দিতে রেখু বলিল, "হ্যাঁ আমার তো ইস্কুল নাই, তোমার সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াই গে।……পাঁচ-মুখীর গ্রামার হ'ল না, বাব্বা, কি যে করি……Gerund is a double part of speech," ……রেখু গালে হাত দিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল। অনু ঘুড়ি আর লাটাই-এর সুতো ঠিক করিয়া লইতেছিল, দেখিল, পাশের বাড়ীর টেপু আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া একটা বিস্কুট চাটিতেছে আর অনুর দিকে তাকাইতেছে—উদ্দেশ্য, অণুর খেলার সাথী হয়। "অণু ঘুড়ি ওড়াবি ?"

অনু মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "অ্যানু ঘুড়ি ওঁড়াবি ? ন্যাঃ ওড়াবে ন্যা।" টেপুর অভিমানে ঘা পড়িয়াছিল, বিস্কুটটার সবটা মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া সে অনুর বুকে চিম্‌টি বসাইয়া দিল।

"হেঁ-এ এ, মুখ ভেঙাচ্চে।"

মুরুব্বি-চালে অনু বলিল, "ছাড়্ টেপু-ভেঁপু, আমার কাছে ……" ঘুসি তুলিল, টেপুও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল। রেখু 'কি হচ্চে' বলিয়া অনুর দিকে তাকাইতেই দেখিল, অনুর বুকে টেপুর চিম্‌টির চিহ্ন তখন বেশ প্রকট, যদিচ কাঁদিতেছে টেপু। রক্ত মুছিতে মুছিতে অনু চিকন সুরে বলিল, "যা, যা বাড়ি যা। কেবল কামড়াবে আর খিমচোবে।" অনু লাটাই-এর শেষ

সুতাটা গুটাইয়া লইয়া বাহির হইতেই, মা মণিমালা রান্নাঘরের দাওয়া থেকে কহিল, "অনু বেলা দশটায় ঘুড়ি নিয়ে যাস্নি বল্চি। কি ছেলে বাবা সকাল থেকে একে আমি কিছু খাওয়াতে পার্লুম না।······দূর্" মণিমালা খুন্তি দেখাইয়া বিড়ালকে শাসাইতেছিল, বিনিময়ে—বিড়াল তার লাল টুক্-টুক্ জিভ আর দাঁত দেখাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"মিউ-উ" অদূরে খড়মের গুজনকরা শব্দ পাইয়া মণিমালা বুঝিল বাবু আসিতেছেন, সন্ত্রস্ত্য হইল।······

বিকেলের দিকে অনুর দৈনন্দিনের তালিকা অনুযায়ী মণিমালার কাছে ইতিহাসের গল্প শুনিবার কথা, হালে নিয়মটা বদলাইয়াছে। অনু এখন সময় পাইলে শতদ্রুদার কাছে যায় গল্প শুনিতে।—কেমন করিয়া সাব্মেরিণ চলে, টর্পেডো ফাটে, জাপানীরা বোমা ফেলে, একরকম পোষাক পরে' চীনা ছেলেমেয়েরা স্বেচ্ছা-বাহিনীতে কাজ করে, মাটিতে গর্ত্ত করে' শত্রুর অপেক্ষা করে, শেখে, জ্ঞান লাভ করে, মার্চ্চ করে মরে। ভাবে, এম্নি সে আর ছোট দিও করিবে।—শতদ্রুর কাছে বসিয়া সে ভাবিতেছে—। বলিল,

"আচ্ছা, আমি যুদ্ধ কর্তে পারিনা শত্দা? ওইতো ধরোনা······"

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই সে দেখিল রাস্তা দিয়া ছোড়্দি চলিতেছে ছুটির পর, তার চুলের বিনুনি আলু থালু, বইগুলো বগলের পাশদিয়া এঁকে-বেঁকে গেছে নেমে—মুখের পাশ হইয়াছে

একটু বেশী লাল। "আজ যাই শতদা—"একছুটে অনু ছোড়্দির সাথী হইল। "ছোড়দি, কি হয়েচে তোর ভাই ?"

……রাত্রি প্রায় ৯টা, রেখুর জ্বর, অনু তাকে বলিতেছে, "তুই ভয় করিস্ কেন ছোড়্দি, জ্বর কি কারুর হয় না ?"

রেখু পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "আমি বুঝি তাই বল্চি ?—আঃ চোখের থেকে হাত সরা, ভার লাগে—" টানিয়া টানিয়া অনু রেখুর চুলে মৃদু মোচ্ড়ানি দিতে লাগিল।

"স্থাখ্ ছোড়্দি, কাল তোর জ্বর ছাড়্লে বাজার থেকে মাগুর মাছ এনে—কালোজিরে দিয়ে, জানিস্ আমি ঝোল রাঁধতে জানি……"

"থাম্ অনু।"

"আচ্ছা তোর মাথা টিপে দিই, কেমন ?"……

অনুর দিদি লতিকা ঘরে ঢুকিল এম্নি সময়।

"অনু, খেতে চল্ শীগ্গীর।"

আব্দারের সুরে অনু বলিল, "আমি জলবার্লি খাবো।"

"ক্যানো ?" লতিকা অনুর ললাটের স্পর্শ অনুভব করিয়া কহিল, "চল্ চল্ খেতে চল্।"

"নাঁ আঁমি খাঁবো না।"

"আহ্লাদ !" লতিকা অনুর গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় কসিয়া দিল।

অনামী

গোধূলী নাম্‌চে·········

বিজন একা। বিজনের দিন ফুরিয়ে' যায়নি, কিন্তু ইচ্ছা-স্রোতে তেমন তরঙ্গ নাই, আশা আর তেমন আশ্চর্য্য হয়না, জীবনের কোলাহল যেন থেমে আস্‌চে। তার এই বয়েস, এই বয়সের কাজ সে করে—আদর, স্নেহ, প্রেম, ভদ্রতা স-ব। কিন্তু বিজনের এ যাত্রা যেন প্রতিবিম্ব মাত্র—মরণের অস্তি-হীন আঁধারেরই যেন সে বাস্তবিক যাত্রী;. মরণ তাকে সফলতা দেবে? স্বর্গে পৌঁছিয়ে দেবে? সে ভাব্‌তে পারেনা। শুধু ভাবে; বিরামের কালো জলে দেবে সে ডুব এই মৃত্যু-শঙ্খের বিষাদ-নিখাদে। জীবনের চ্যঞ্চল্য চঞ্চল বলেই যদি দামী হয়, মৃত্যুর শান্তি গভীর বলেই কেন শান্ত নয়! দেহ ভস্মীভূত হয়ে' আত্মা না-ই বা পুনরাগমন কর্‌লো—হ'লইবা সব-শেষ রাসায়ণিক হেরফের, একেবারে নিঃশেষ—তবু মৃত্যুর সেই ক্ষণগুলো—ঘন হয়ে' আস্‌চে জীবনের ক্লান্তি, বেদনার মত কঠিন হয়ে, সান্ত্বনার মত সে বেদনা, নৈরাশ্যের অথই শূণ্যতার পরতে পরতে—চোখ দুটো আছে মেলে তাতে আছে কি করুণ মুহ্যমান পরাভব—সে যে সত্যই সত্য!

গোধুলী নাম্‌চে, বিজন একা·········

পরাজয় আর প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য আর প্রাচুর্য্য বিজনের জীবনে সব হয়েচে। পেয়েও তার প্রেম ব্যর্থ-প্রেম, সব জেনেও তার জ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, উদার-হৃদয় হয়েও অনুদারতার বেড়া-জালে তার কারাগারে তার ইচ্ছা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন !

গালে হাত দিয়ে বিজন আছে বসে'। চারদিকে মাঠ ধান-ক্ষেত, রাখাল ছেলে, পথিক, পাখী, শব্দ আর গোধূলী।······ গোধূলী নাম্‌চে শান্ত মাঠের কিনার ঘিরে। কত কালের এই বৃদ্ধ রক্ত-রাগের তারুণ্যের খেলা, কত দূর অতীতের এই ছিল্‌কে-ওঠা আভা, গাছে-পাতায়, ঘোলা ডোবার শুক্‌নো পানার গায়ে গায়ে, গ্রাম-ঘন ধূসর-সবুজ স্তূপে-স্তূপে !

একটা গরু মলিন চোখে তাকিয়ে আছে, কে তাকে গৃহে নেবে ফিরিয়ে; একটা পাখী টুক্‌-টুক্‌ করে' এই অবেলার আহার খুঁটে নিচ্চে, আর তাকাচ্চে; গোটা চার পাঁচ ভারী বলদ আর একটা রাখাল ছেলে চলেচে আয়াসে ধাপ ফেলে ফেলে।······

বিজন দেখ্‌চে। চার পাঁচ গোছা শুক্‌নো ঘাসের ওপর এসে পড়েচে ক্লান্ত লালিমা, কাটা গাছের ভাঙা গুঁড়ির ওপরে, আর একদিক থেকে লেগেছে তারই ক্ষীণ একটু প্রতিচ্ছবি। গোটা কয়েক ডেঞে পিঁপ্‌ড়ে বার বার মাথা তুল্‌চে আর নামাচ্চে কিছু-একটা চাঞ্চল্যে। দূর থেকে আস্‌চে জমাট্‌-বাঁধা নর-কোলাহলের পেষণ-হত স্তব্ধ গুঞ্জরণ।······

দুই ফালি ঘন মেঘ জমে' আছে অস্তায়মান সূর্য্যের বাঁ পাশ ঘেঁসে, পাথরের মত শক্ত আর প্রাণহীন—মুখে আছে আগুনের

মত একটু লাল। ধোঁয়া ধোঁয়া কি সব যেন ঘুরে চলেচে মাটির ওপর দিয়ে আকাশের নীচে। প্রকাণ্ড মাঠের অত্যুচ্চ শূণ্যতা, আধকাটা ফসলের আহত সামঞ্জস্যের বিদীর্ণ বিক্ষোভ। আর এক পর্দা নেমে এলো রাঙা আলোর লহর মাটির বুকের কাছে মুখ এগিয়ে।······

পথের একটা রেখা ধরে' তার লেগেছে একটু রঙ্, গোরুটার বিশীর্ণ নয়নের ওপরে খেল্‌চে তার একটু তাপ, বোবা শ্রান্তির মত গেছে ছুঁয়ে বেলা-শেষের দুয়েকটা পথিকের বিরল দেহা-বরণের এপাশে-ওপাশে। বিজনের মুখে ঔদাস্যের অবশ দ্যুতি ······বিজন ভাব্‌চে। হায়রে গোধূলীর আলো! মাটির অবয়বে তার এ ক্ষীণ লীলা! গাঙ্ ধরে' চলেচে নৌকো-নাবিক—দুধার দিয়ে দাঁড়িয়েচে ঘন বাঁশ বন—আর গাঢ় জাম ঝোপ! জলের ছোটো ছোট কোণে একাধটুকু চিকি-মিকি, দুয়েকটা বুদ্বুদ তাতে অথির হয়ে' উঠ্‌চে, দুয়েকটা তরঙ্গ তাতে সব ভুলে, যাচ্ছে। ঘাটে ঘাটে কল্‌সী কাঁকে ক্লান্ত বধূর বিবশ পদক্ষেপ—উন্মাদনাহীন, স্বাদহীন, গতানুগতিক।

বিজন পরিশ্রান্ত। গোধূলীর আলো নাম্‌চে। নাম্‌চে নাম্‌চে, নাম্‌চে। কোন্ রসাতলে নাম্‌বে কে-না জানে! সূর্য্য-তেজের আকাশচুম্বী দেদীপ্যমানতা পশ্চিম আকাশ পাড়ি দিয়ে এলো যে, এই শীর্ণ রক্তালুতার মদালস বিবিক্ততা নিয়ে।······

সন্ধ্যা আস্‌চে। রাত্রির বুকে থেমে যাবে তার সব স্পন্দন, সব আলো, সব। একদিনের এই যাত্রা, কে-না জানে; কে-না

জানে কল্পনার মত ভঙ্গুর এই বার্দ্ধক্যে ভরা যৌবনের রক্ত-গীতের ইতিহাস!

একদিনের মত মানুষ নেবে বিরাম। ঘুম এসে দেবে ঘুম পাড়িয়ে। দুগ্ধফেননিভ শয্যার কিনার দিয়ে, জীর্ণ নোংরামিকে সুড়্ সুড়ি দিতে দিতে, ক্লেদ-কঠিন ধরিত্রীর কপট প্রবীনতার হিসাব খাতার পাতা মুড়ে আস্‌বে ঘুম। কিন্তু ঘুম তো চিরঘুম নয়? মৃত্যুও তো জীবনের শেষ নয়? ঐ গোধুলীর আলোও তো আজই গেল একেবারেই গেল নয়!……

অজ্‌কার প্রেমিকের স্বপ্ন যদি প্রেমিকার আলিঙ্গনে সফল না হয় কাল তার আশা পল্লবিত হবে; আজ যে স্নেহ বৃথা-মায়ার উদারতায় লোহার্ত্ত, ক্রূরতার শরাঘাত-তৎপর, কাল সে স্নেহের মনি ঘৃণাতুর ঔদার্য্যে যাবে পথ বদ্‌লে; যে দারিদ্র্য, যে অশুচিতা যে-বিক্ষোভ আজ উঠ্‌চে ক্ষিপ্ত দুর্ব্বার ছন্দ আর বেগ বেঁধে কল্পনার মত তা যাবে কাল নেমে, তলিয়ে, মুছে……কোথায়?

গোধুলির আলো, ঐ যে সন্ধ্যার কালি সমুদ্রে দেবে ডুব তারই চলেচে আয়োজন।

ধনবানের উদ্বৃত্ত ধন, তার সেই সুখ-সওদার আরাম-বেসাতির পরশমণি থেকে গেল, কিন্তু, তার সে লোলুপতা আজ নাই। না-ই থাক্ তবু আছে ছিন্ন-ভিন্ন রক্ত-পিপাসার কদর্য্য মানব ইতিহাস! এক গেল দুই এল, আবার এলো—ফিরে ফিরে চলেচে এই বিষাক্ত আয়োজনের বিবিক্ত বিবৃতি—সভ্যতা! তুমি আমি তার কেউ নই, তোমার আমার কিছু নাই আছে শুধু

বাসনাস্রোতের বিশিষ্ট হিল্লোল, আর উদ্দাম তরঙ্গমালার জৈবী জিহ্বার জান্তব লুব্ধতা !

দরিদ্রের বিষণ্ণ কুটিরের মৃত নিরালম্বতা, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে বইছে তাতে যুদ্ধ-অধীর ঘর্ম্মাক্ত আক্ষেপ, আরো আক্ষেপ আস্‌চে ভিড় করে' সব জ্বালা, সব দুঃখ সব বেদনার দাহ ঘিরে—

তবু চলেচে ঐ পুনরাবৃত্তি—ঐ অর্থহীন ব্যর্থ কারুক্রম !

মৃত্যু যাকে ধুইয়ে দিচ্চে, জীবন তাকে আবার দেবে অমর জীবন এমন আশা কে দিয়েচে মানুষের বুকে ? তার সত্য-অমৃতত্ব ? তার মিথ্যা-লিপ্সা ? তার কপট পরাভব ?......

এলো সন্ধ্যা, এলো অন্ধকারের ছিন্নমস্তা নিবিড় অভিযান। কালো হয়ে' গেল মাঠ। ঘাটে বধূরা আর আস্‌চেনা ! পাখী প্রাণী সব থেমে গেছে ! জীবনের পরদার পট পরিবর্ত্তন !—কাল যখন আবার জাগরিত হবে এই নির্লজ্জ পৃথিবীর উলঙ্গ প্রবৃত্তির অবারিত কলঙ্ক—তখন এরাই কি আবার জাগবে ? এই আলো ? এই নরনারী ? এই খেলা ? এই দ্বন্দ্ব ?

বিজনের চোখে আঁধার, আর, সারা অবয়বে কালি ঢালা কাঠিন্য, শিল্যুট্‌ ছবির মত তা' উৎকীর্ণ, মূর্ত্ত ; আরো আঁধার প্রকৃতির সারা দেহে।......

কলিকাতা ১৯৩৯।

সমাপ্ত